সংকলন ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

Allah is Preparing us For Victory

আল্লাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন

সংকলন ও সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান
লেখক, সাংবাদিক ও কলামিষ্ট

খান প্রকাশনী
দোকান নং ৩৮, ইসলামী টাওয়ার,
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন ০১৭৪০১৯২৪১১

Allah is Preparing us For Victory

আল্লাহ্ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন

সংকলন ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

Email: ishak.khan40@gmail.com

মোবাইল: ০১৭৪০১৯২৪১১

খান প্রকাশনী

দোকান নং ৩৮, ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ফোন ০১৭৪০১৯২৪১১

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০১২।

মূল্য ঃ ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র

Allah is Preparing us For Victory

PUB: KHAN PROKASHONI

PRICE: 60.00 TK. 3 DOLAR (US)

সূচীপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্য, যিনি বিচার দিসের মালিক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা., তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবাগণ এবং সকল মুমিনের প্রতি।

বক্ষমান বইটি **শায়খ আনোয়ার আল আওলাকি রহ.** -এর ঐতিহাসিক ভাষণ Allah is Preparing us For Victory এর বাংলা অনুবাদ।

আনওয়ার আল-আওলাকি রহ. ছিলেন একজন উঁচুমানের বিদগ্ধ মুসলিম আলেম যিনি নিউ মেক্সিকোতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাতা ইয়েমেনী। ইয়েমেনেই তাঁর জীবনের এগারো বছর কাল অতিক্রান্ত হয়। সেখানে তিনি ইসলামের উপর প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইয়েমেনের প্রখ্যাত আলেমগণের সান্নিধ্যে শরীয়াহ্-র উপর পড়াশোনা করতেন। এছাড়াও তিনি কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি.এস.সি. এবং সান ডিয়েগো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এডুকেশন লিডারশিপে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন।

আনওয়ার আল-আওলাকি কলোরাডো ক্যালিফোর্নিয়াতে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে অবস্থিত 'দারুল হিজরাহ' ইসলামিক সেন্টার এবং জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মুসলিম প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁর বহুল জনপ্রিয় অডিও সিরিজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - "Lives of the Prophets", "The Hereafter", "The Life of Muhammad (saws)", "The Life and Times of Abu Bakr Al-Siddique (ra)", "The Life and Times of 'Umar Ibn Al-Khattab (ra)", "The Story of Ibn Al-Akwa", "Constants on the Path of Jihad", এবং আরও অনেক।

এই বইয়ের মূল বক্তব্যটি ইংরেজিতে একটি অডিও থেকে লিখিত হয়েছিলো। সেখান থেকে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। যার কারণে বিষয়টি বাংলাভাষাভাষীদের কাছে সাবলীল করার জন্য সংকলক ও সম্পাদকের পক্ষ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই কিছু বাক্য, শব্দ বর্ধিত করতে হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ করতে হয়েছে। তবে সবসময়ই শায়খের মূল বক্তব্য এবং মূল ভাবকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আশা করি এই গ্রন্থনাটি মুসলিমদেরকে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

কিছুদিন পূর্বে শায়খ আওলাকি রহ. ইয়েমেনে শাহাদাত বরণ করেছেন। আল্লাহ সুবঃ জান্নাতে তাঁর মর্যাদা আরো উন্নীত করুন। আমাদেরকেও দীনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার তাওফীক দিন। আমীন।

বিনীত: **-মুহাম্মাদ ইসহাক খান,**

Email: ishak.khan40@gmail.com

আল্লাহ্ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন

إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه.

"যখন আল্লাহ কোনো কিছু চান, তখন তিনিই তার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে দেন।"

-উল্লিখিত এই মূলনীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে ইমাম ইবনে আসীর রহ. এর কালজয়ী ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-কামিল' থেকে। যার সারমর্ম হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি কখনো কোনো অবস্থার সমাপ্তি চান তাহলে তিনি এমন পরিস্থিতি ও উপায় উপকরণ তৈরী করে দেন, যা সব কিছুকে সেই সমাপ্তির দিকেই পরিচালিত করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যদি এই উম্মাহর বিজয় চান তাহলে তিনি এমন পরিবেশ, পরিস্থিতি তৈরী করবেন, যা এই উম্মাহর বিজয়কে ত্বরান্বিত করবে। আর সেক্ষেত্রে আপনারা (যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেছেন) বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি দেখেই বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিম জাতির বিজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। বর্তমানে যা কিছু ঘটছে, সেই ঘটনা প্রবাহ থেকে বিজয়ের আগাম বার্তা পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা যদি ধরে নেই যে, ইমাম ইবনে আসীর রহ. এর এই মূলনীতিটি সঠিক, তাহলে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হবো যে, বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ইনশাআল্লাহ্ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

বিজয়ের ব্যাপারে আমরা যদি কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত সাধারণ মূলনীতিগুলোর দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কুরআনে এই উম্মাহর বিজয়ের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই উম্মাহকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন।

অতএব এটা আমাদের ঈমান ও আকীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি - এই উম্মাহই অবশেষে বিজয়ী হবে, তাতে তাদের বর্তমান অবস্থা যাই থাক না কেন। আর এই উম্মাহর বিজয়ের ব্যাপারে আপনার মনে যদি কোনো সন্দেহ-সংশয় থাকে তাহলে বুঝতে

হবে যে, আপনার ঈমান-আক্বীদায় নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে। কেননা এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে বিবৃত দলীলগুলো এতোই মজবুত ও সুস্পষ্ট যে, বিষয়টিকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই।

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য নিম্নে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু দলীল উপস্থাপন করছি। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.

অর্থ: "আর আমি পূর্ববর্তী উপদেশের (তাওরাত) পর যবূর-কিতাবেও লিখে দিয়েছি যে, সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণই অবশেষে পৃথিবীর অধিকার ও কর্তৃত্ব লাভ করবে।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৫)

সুতরাং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.

অর্থ: "আমার বান্দা ও রাসূলগণের ব্যাপারে আমার এ সিদ্ধান্ত অনেক আগে থেকেই হয়ে আছে যে তাদেরকে নিশ্চয়ই (আমার পক্ষ থেকে) সাহায্য করা হবে এবং আমার বাহিনীই (সর্বশেষে) বিজয়ী হবে।" (সূরা সাফফাত, আয়াত ১৭১-১৭৩)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই এই পৃথিবী আল্লাহ্র; তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে খুশি কর্তৃত্ব দান করেন, তবে চূড়ান্তভাবে মুত্তাকীগণই এর কর্তৃত্ব লাভ করবে।" (সূরা আ'রাফ, আয়াত ১২৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ জমিনের কর্তৃত্ব সাময়িক সময়ের জন্য মু'মিন বা কাফির যাকে খুশি দান করতে পারেন কিন্তু চূড়ান্ত ভালো পরিণতি কেবলমাত্র মুত্তাকী মু'মিনদের জন্যই। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

অর্থ: “ওরা চায় ফুৎকার দিয়ে আল্লাহ্র আলো নিভিয়ে দিতে, কিন্তু আল্লাহ্ তা পূর্ণাঙ্গ করবেনই, কাফিরদের নিকট যতই তা ঘৃণা ও গাত্রদাহের কারণ হোক।” (সূরা তওবাহ্, আয়াত ৩২)

আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে কাফিররা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য। তারা প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে আল্লাহ্র আলো তথা তাঁর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম এবং মুহাম্মাদ সা. এর রিসালাহ নির্বাপিত করতে।

ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজকে বাঁধাগ্রস্থ করার জন্য এমন কোনো হীন পন্থা ও কাজ নেই যা তারা অবলম্বন করছে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, এ কাজে তারা সর্বোতভাবে ব্যর্থ হবে।

তারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য যে পরিমাণ অঢেল অর্থ খরচ করে, তা যে কাউকে বিস্মিত করবে। ভেবে দেখুন, আল্লাহ্ ওদের কত নিয়ামত দান করেছেন, ওদের হাতে কত সহায় সম্পদ রয়েছে, অথচ সবকিছুই ওরা বিনিয়োগ করছে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য!

আমরা মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ লোকেরাই আজকাল শুধু অনুযোগ করে বলি, আমরা তাদের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করবো? ওরা মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে, পৃথিবীর তাবৎ বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র ওদের মুখপাত্র, সকল ক্ষমতাধর রেডিও স্টেশন ওদের দখলে, পৃথিবীর প্রভাবশালী মিডিয়া ওদের কব্জায়, সরকার ও পুলিশ বাহিনী ওদের বশীভূত; এক কথায় গোটা বিশ্বই আজ তাদের করতলে। পৃথিবীর যাবতীয় কলকাঠি ওরাই নাড়ছে। ওদের হাতে যাবতীয় অর্থকড়ি, সহায় সম্বল। অতএব রণে ভঙ্গ দেয়া ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই। তাই আমাদের উচিত সংগ্রামের পথ পরিহার করে বিকল্প কোন উপায়ে ওদের মোকাবেলা করা; সম্মুখ সমরে আমাদের যাওয়া উচিত নয় যেহেতু কোনভাবেই আমরা ওদের সমকক্ষ হতে পারব না! বরং রাজনীতি ও কূটনীতির আশ্রয়ে ওদের মোকাবিলা করাই শ্রেয়।

অথচ আমরা যদি আল্লাহর কুরআন মনোযোগ দিয়ে পড়তাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারতাম যে, ইসলামকে প্রতিরোধের জন্য তাদের এই শত শত মিলিয়ন ডলার বাজেট দেখে আমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কারণ স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ.

অর্থ: "...বস্তুতঃ এখন ওরা আরও ব্যয় করবে। খানিকপর তাই ওদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত ওদের পরাজিত করা হবে। আর কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।" (সূরা আনফাল, আয়াত ৩৬)

সুতরাং তাদেরকে তাদের কাড়ি কাড়ি টাকা, শত শত বিলিয়ন ডলার খরচ করতে দিন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তারা প্রথমে তাদের অর্থবিত্ত ও সহায় সম্পদ খরচ করে নিঃস্ব হবে, মনোক্ষুন্ন হবে; তারপর তাদের উপর পরাজয়ের গ্লানী নেমে আসবে। সুতরাং আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে তাদেরকে তাদের সম্পদ খরচ করতে দেখে আমাদের বরং আরো খুশী হওয়া উচিত। কেননা, এর অর্থ হলো তাদের পরাজয় ঘনিয়ে আসছে এবং ইসলামের বিজয় অতি সন্নিকটে চলে আসছে।

তাদের অর্থনৈতিক রক্তক্ষরণের কথা এখন আর তারা নিজেরা গোপনও রাখতে পারছে না। এখন তারা নিজেরাই বলছে যে, আফগান ও ইরাক যুদ্ধ তাদের জন্য ভিয়েতনাম ও কোরিয়ান যুদ্ধের চেয়েও বেশী ব্যয়বহুল হয়ে এক বিশাল অর্থনৈতিক বিপদ ডেকে এনেছে।
কোরিয়ান যুদ্ধে তাদের ব্যয় হয়েছিলো ২০০ বিলিয়ন ডলার আর ভিয়েতনাম যুদ্ধে তাদের ব্যয় হয়েছে ৪০০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ইরাক যুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০০ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে গেছে। আরো হচ্ছে। মার্কিন অর্থনীতি ক্রমশ মুখ থুবড়ে পড়ছে। তাদের অর্থ খরচের বহর দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে যে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কারণে অচিরেই তাদের অর্থনীতিতে ভয়াবহ ধস নামবে। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহর আয়াতের বর্ণনার সাথে তাদের অবস্থা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। তারা এভাবে তাদের সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে খরচ করবে এবং তারপর তারা

নিজেরাই আফসোস করবে। এটা তাদের হাতের কামাই। নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম। অতএব এর পরিণতি তাদেরকে ভোগ করতেই হবে। কারণ ইরাক ও আফগান যুদ্ধে আসার জন্য কেউ তাদেরকে বাধ্য করে নি, বরং অন্যের পায়ে পারা দিয়ে ঝগড়া করার মতো তারা নিজেরা স্বেচ্ছায় এই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে। অতএব নিজেদের হাতে নিজেদের মৃত্যুকূপ খনন করার পরিণতি তারা শীঘ্রই টের পাবে। কিন্তু তখন তাদের আর কিছুই করার থাকবে না। আল্লাহর আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী তারা তাদের সম্পদ খরচ করবে, আফসোস করবে এবং তারপর তারা সদলবলে পরাজিত হবে।[১]

আমেরিকার যুদ্ধংদেহী মনোভাবের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তাদের আদর্শিক গুরু আবু জাহেলের ঘটনায়, যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বদরের ময়দানে এসে হাযির হয়েছিলো। অথচ তার যুদ্ধ করতে বদরের ময়দানে আসার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। মুসলিমরা যে বাণিজ্য বহরকে তাড়া করেছিলো, তা নিরাপদ অবস্থানে চলে গিয়েছিলো। এমনকি বাণিজ্য বহরের নেতৃত্বে থাকা আবূ সুফিয়ান তাকে দূত মারফত পত্র পাঠিয়ে জানিয়েছিলো যে, আপনারা মক্কায় ফিরে যান। আমি আমার বাণিজ্য বহর রক্ষা করে নিরাপদ অবস্থানে চলে এসেছি।

কিন্তু ঔদ্ধত, দুর্বিনীত আবু জাহেল অহংকার প্রদশন করে বলেছিলো, "না, আমরা অবশ্যই যাবো এবং তাদের মোকাবিলা করবো। আমরা বদরে যাবো, সেখানে তিনদিন থেকে আনন্দ ফূর্তি করবো, মদপান করবো, নর্তকীরা নেচে-গেয়ে আমাদের মনোরঞ্জন করবে। আমি চাই গোটা আরববিশ্ব আমাদের যুদ্ধযাত্রার খবর শুনুক এবং জেনে নিক যে কুরায়শদের

---

[১] ইতিপূর্বে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে অর্থ খরচের পরিণতিতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আমরা দেখেছি। আর শায়খ পশ্চিমা বিশ্ব সম্পর্কে এ বক্তব্য দিয়েছিলেন বেশ কয়েকবছর পূর্বে। ইতোমধ্যে গোটা পৃথিবীতে বিশেষত পশ্চিমা বিশ্বে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দা তথা ধ্বস আমরা দেখতে পেয়েছি তা শায়খের উক্ত বক্তব্যকে বাস্তবে প্রমাণ করেছে। তাদের এ রক্তক্ষরণ এখনও চলছে। আর শীঘ্রই আসছে এর চেয়েও আরো বড় বিপদ।

আত্মসম্মানে আঘাত করা কিছুতেই বরদাশত করা হবে না। বদর ময়দানে তিনদিন অবস্থান করে গোটা আরবে এই বার্তা পৌছে দেয়া হবে যে, কুরায়শদের দিকে কেউ হাত বাড়ালে তা কিছুতেই সহ্য করা হবে না। অতএব কেউ যেনো আর কোনোদিন কুরাইশদের বিরুদ্ধে লড়ার দুঃসাহস না দেখায়। (বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদীস ও সীরাত গ্রন্থের বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

সেদিন আবু জাহেল যেরূপ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বদরের ময়দানে এসেছিলো, যুদ্ধ বেছে নিয়েছিলো, ঠিক একইভাবে বর্তমানে আমেরিকাও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছে এবং আবু জাহেলের পথ বেছে নিয়েছে। তাদের উপর কোনো যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়নি, বরং তারা নিজেরাই এই যুদ্ধ বেছে নিয়েছে। আর এ যুদ্ধের পরিণতি ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আর তাদের এই পরিণতি তো অবধারিত।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আল্লাহ চলেছেন,

من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب.

অর্থঃ "যে কেউ আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" (সহীহ আল-বুখারী, হাদীসে কুদসী অধ্যায়। সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৩৪৭।)

সুতরাং মনে রাখা দরকার যে মুসলিমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি, বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন! আমেরিকা গোটা বিশ্বের মালিক মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাথে স্পর্ধামূলক যুদ্ধে লিপ্ত!

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَىٰ لَهُمْ

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَـٰسِقُونَ.

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছো এবং সৎকর্ম করেছো তাদের সাথে মহান আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই আবারও খিলাফত দান করবেন, যেমনটি তিনি পূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছিলেন। তিনি তোমাদের জন্য তাঁর পছন্দনীয় জীবন বিধানকে সুনিশ্চিত করে দিবেন এবং তোমাদের ভীতিকর পরিস্থিতিকে নিরাপত্তার দ্বারা বদলে দেবেন। (শর্ত হলো) তারা (জীবনের সকল ক্ষেত্রে) কেবল আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। তবে এরপরও যারা কুফরী করবে, তারা হলো ফাসিক।" (সূরা নূর,আয়াত ৫৫)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে খিলাফত তাদেরকেই দেয়া হবে যারা সত্যিকারভাবে ঈমান আনয়ন পূর্বক আমালে সালিহ বা সৎকর্ম করবে।

বর্তমান সময়ে গোটা মুসলিম উম্মাহ এক ভয়াবহ শংকা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করছে। আর এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করবেন। তিনি এই উম্মতকে খিলাফত ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; এবং এ দুনিয়াতে চূড়ান্তভাবে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার ওয়াদা দিচ্ছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীতে উম্মাহর কাল পরিক্রমা ও খিলাফাহর প্রত্যাবর্তন :

একটি হাদীস রয়েছে যে হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মুসলিম জাতির কাল পরিক্রমা কেমন হবে তার উপর বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেকের উচিত হাদীসটি সতর্কতা ও মনোযোগের সাথে পাঠ করা। হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ

أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ سَكَتَ.

অর্থঃ "তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে নবুয়্যতের আদলের খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, অতঃপর আল্লাহ তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে বংশীয় শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন। অতঃপর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের ওপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন। অতঃপর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর ফিরে আসবে নবুয়্যতের আদলের খিলাফত।' এরপর তিনি সা. নীরব থাকলেন। (মুসনাদে আহমদ)

আলোচ্য হাদীসে যে নবুওয়াতের ধারার কথা বলা হয়েছে তা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের সাথে সাথে সমাপ্ত হয়ে গেছে। এরপর তিনি যে খুলাফায়ে রাশেদার কথা বলেছেন তা আরম্ভ হয়েছে হযরত আবূ বকর রা. এর মাধ্যমে আর তা সমাপ্ত হয়েছে হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রা. এর খিলাফতের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে। এরপর তিনি বলেছেন 'মুলকান' যার অর্থ হলো রাজতান্ত্রিক শাসন। এর বাস্তবায়ন হয়ে গেছে বনু উমাইয়া, বনু আব্বাস ও উসমানী খিলাফতের মধ্য দিয়ে। এরপর তিনি যে জুলুমতন্ত্রের কথা বলেছেন তা হলো আমাদের বর্তমান সমসাময়িক কাল। এটাই হলো স্বৈরাচারী জুলুমতন্ত্র। এরপর আবার আসবে খিলাফাতে রাশেদা। এভাবে পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু শেষে মৌনতা অবলম্বন করেন, তা থেকেই এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে অভিযোগ না করা

কখনও আমরা সময়ের বা কালের অভিযোগ করে থাকি। (নিজের দায়িত্ব এড়ানোকে বৈধতা দেয়ার জন্য) আমরা বলে থাকি যে, আমরা সবচেয়ে খারাপ সময়ে বসবাস করছি, মুসলিম উম্মাহ্ আজ মারাত্মক দূর্বল, অসহায়, পরাজিত, বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত। আহ! আমরা যদি সাহাবায়ে কিরামের যুগে জন্ম নিতাম! কিংবা ইসলামের স্বর্ণালী যুগে থাকতাম! তাহলে কতইনা ভালো হতো। কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই না আমরা পালন করতে পারতাম।
এমন অভিযোগ করা আমাদের জন্য কেনো মোটেই শোভনীয় নয়, কিছু যৌক্তিক কারণ নিচে তুলে ধরা হলো,

প্রথম কারণ:

জনৈক তাবেঈ একজন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আপনাদের মাঝে ছিলেন, তাঁর সাথে আপনারা কী রূপ আচরণ করতেন? কিভাবে তার সমাদর করতেন?"
উত্তরে সাহাবী বললেন যে কিভাবে তারা রাসূলের সাথে উত্তম আচরণ করতেন এবং তিনি বললেন যে তারা আল্লাহর রাসূলের সমাদরের ব্যাপারে তাদের সামর্থের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করতেন।
সাহাবীর কথা শুনে তাবেঈ বললেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের জীবদ্দশায় পেলে তাঁকে কাঁধে তুলে রাখতাম।"

এখানে আমরা তাবেঈর কথা একটু বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারবো। তিনি যেনো বলতে চাচ্ছেন যে, সাহাবায়ে কিরামগণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেন নি এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সময়ে যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তারা সাহাবীদের চেয়েও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরো বেশি সমাদর করতেন ও মর্যাদা দিতে পারতেন।

তার কথার উত্তরে সাহাবী বললেন, সাহাবায়ে কিরামগণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেমন মর্যাদা দিতেন, কেমন

ভালোবাসতেন, তাঁরা দীনের জন্য কেমন আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন তা এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে যথাযথভাবে বোঝা সম্ভব নয় যে সেই সময় উপস্থিত ছিলো না। তিনি আরো বললেন "কেউ জানে না, সে সময় জীবিত থাকলে সে কী করত; আমাদেরকে নিজের জন্মদাতা পিতা ও আপন ভাইদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে হয়েছে, যা কখনই সহজ কোন ব্যাপার ছিল না। আর এখন তোমাদের পিতা, মাতা, ভাই, পরিবার, পরিজন সবাই মুসলিম। আর তুমি কেবল ধারণা করছো যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সময় বেঁচে থাকলে তোমরা তাঁকে আরো বেশি মর্যাদা দিতে। শোনো এমন কোনো কিছু (সম্মান বা দায়িত্ব) কামনা করো না, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বরাদ্দ করেন নি।

দ্বিতীয় কারণ :

আমাদের বর্তমান সময় নিয়ে অভিযোগ করা উচিত নয়; বরং আমাদেরকে যে আল্লাহ তা'আলা এই সময়ে পাঠিয়েছেন সেজন্য আমাদের উচিত আল্লাহর প্রতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া। কেনো আমাদের আরো বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত? আসুন ভেবে দেখি!

আমরা জানি যে, গোটা মুসলিম উম্মাহর মাঝে সাহাবীগণের মর্যাদা হলো সবার উপরে। নবীদের পরে মানুষের পক্ষে সম্ভব সর্বোচ্চ আসনে তাঁরা অধিষ্ঠিত। তাদের পর রয়েছেন তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবেঈগণ এবং রয়েছেন তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবে-তাবেঈগণ।
সাহাবায়ে কিরামগণের মর্যাদা এতো বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ হলো তাঁরাই সুমহান ইসলামের ভিত্তিমূল রচনা করেছেন। ইসলাম নামক প্রাসাদটিকে শূন্য থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তাঁদের জান ও মালের কুরবানীর উপরই নির্মিত হয়েছে ইসলামের প্রাসাদ। তাঁরা যখন কাজ করেছেন তখন ইসলামের কিছুই প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। তাঁরা এই দ্বীনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তাঁদের পর যারাই এসেছেন তাদের সবার সামনে দ্বীনের প্রাসাদ নির্মিতই ছিলো, তারা হয়তো এই ভিত্তির সাথে এখানে ওখানে এক দু'টো উপাদান যোগ করেছেন অথবা কালের আবর্তনে দ্বীনের আসল প্রাসাদের গায়ে বিদআত নামক আগাছা, পরগাছা গজালে বা

শেওলা ধরলে তা হয়তো কেটে-কুটে, ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করেছেন। কিন্তু দ্বীনের মূল প্রাসাদ তো সাহাবায়ে কিরামদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। অতএব সংস্কারক বা সৌন্দর্যবর্ধনকারী তো নিশ্চয়ই মূল প্রাসাদ নির্মাণকারীর সমান মর্যাদা পেতে পারে না।
মূল কথা হলো, সাহাবায়ে কিরাম রা. এর সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তির কারণ হলো তাঁদের কাজটি ছিলো সবচেয়ে বেশি কঠিন কাজ এবং তাঁরা সেটি আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাঁদের পক্ষে সম্ভব সর্বোচ্চ কুরবানী করেছেন।

পরিস্থিতির ব্যাপারে অভিযোগ না করে আমরা যদি সত্যিই কিছু করতে চাই তাহলে আমাদের উচিত সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা। সময়ের দাবী উপলব্ধি করে আমাদের দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করা।
কারণ উম্মাহর পরিস্থিতি অনুযায়ী একেক সময়ে একেক ধরণের কাজ সময়ের দাবী হয়ে দাঁড়ায়। আর একারণেই দেখা যায় যে, তাবেঈগণ হয়তো গুরুত্বারোপ করেছেন এক বিষয়ের উপর তো তাবে তাবেঈনগণ গুরুত্বারোপ করেছেন অন্য এক বিষয়ের উপর। বিষয়টি আরো ভালো করে বোঝার জন্য আমরা কিছু উপমার দিকে লক্ষ্য করতে পারি।

ইমাম বুখারী রহ. :
ইমাম বুখারী রহ. যদি একশ বছর পর এসে হাদীস সংকলনের সেই একই কাজ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই উম্মাহর মাঝে তাঁর সেই অবস্থান ও মর্যাদা তৈরী হতো না যে মর্যাদা উম্মতের মাঝে এখন তাঁর রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী ব. ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর আবির্ভাব যদি আরো এক শতাব্দী পর হতো এবং তাঁরা যদি ফিকহী বিষয়ে গবেষণার সেই একই কাজ করতেন তাহলেও আমাদের মাঝে বর্তমানে তাঁদের যে স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে তা কিন্তু থাকতো না। কারণ তাঁদের প্রত্যেকের সমকালীন প্রয়োজন ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। আর এভাবে সময়ের ব্যবধানের কারণে যুগে যুগে প্রয়োজনের ভিন্নতা তৈরী হওয়াটাই স্বাভাবিক।
আরেকটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন যে, ফিকাহ শাস্ত্রের চারজন ইমামেরই আবির্ভাব হয়েছে একই শতাব্দীতে এবং হাদীস শাস্ত্রের ছয়জন

ইমাম তথা ছিহাহ সিত্তার ছয়জন সংকলকের আবির্ভাবও একই শতাব্দির মধ্যে। এ থেকে বোঝা যায় যে, একটা সময় উম্মতের প্রয়োজন ছিলো ফিকহী মাসআলা-মাসায়েলের উপর গবেষণা তো আরেকটি যুগের প্রয়োজন ছিলো আল্লাহর রাসূলের হাদীসসমূহকে যাচাই বাছাই করে সংকলন ও সংরক্ষণের।

এ বিষয়ের উপর আমার এতো কথা বলার কারণ হলো, আমরা অনেক সময় আল্লাহর দীন ইসলামের বিজয়ের জন্য কাজ করতে চাই কিন্তু ইসলামের বিজয়ের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোন কাজটা করতে বলেছেন, কিভাবে করতে বলেছেন তা সঠিকভাবে জানা না থাকার কারণে আমরা আমাদের অর্থ, সময়, মেধা, শ্রম এমন কাজে ব্যয় করি, যা বাস্তব অর্থে দ্বীনের কোনো কাজেই আসে না। তাই আমরা যদি সত্যিই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইখলাসের সাথে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে আগে জানতে হবে, বর্তমান সময়ের জন্য কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি জরুরী এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কোন কাজ করতে বলেছেন এবং বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আল্লাহর নির্দেশিত সেই কাজ কিভাবে সর্বোত্তম পন্থায় আঞ্জাম দেয়া যাবে।

আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের কতিপয় দ্বীনী ভাই শুধু দা'ওয়াতী কাজের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আবার অন্য কিছু ভাইয়েরা রয়েছেন, যারা শুধু ইলম অর্জনের পথে লেগে থাকতে বলেন। আমরা স্বীকার করি যে, দাওয়ার কাজ করা ও ইলম অর্জন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং শুধু এ দু'টো কাজই নয়, বরং ইসলাম আমাদের যতো কাজের আদেশ দিয়েছে স্ব স্ব স্থানে তার প্রত্যেকটিরই গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আমরা যদি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি? তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের বর্তমান সময়টির সবচেয়ে বেশী মিল রয়েছে সরাসরি সাহাবায়ে কিরামদের সাথে। কারণ বিগত চৌদ্দশ বছরে আমরা জাহেলিয়াতের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে

গেছি। বর্তমান মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন এতো প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেছে যা বিগত চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে আর হয় নি।
আমরা যদিও আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে শুধু অভিযোগ করি আর আমাদের অবস্থা যদিও আক্ষরিক অর্থে হুবহু সাহাবায়ে কিরামের সময়ের মতো নয়, তথাপিও সার্বিক বিচারে আমরা দেখতে পাই যে, এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে সাহাবায়ে কিরামদের সময়ের সাথে। এই বক্তব্যের সমর্থনে যে বিষয়গুলো তুলে ধরা যেতে পারে তা হলো:

ক. (মাক্কী জীবনে) সাহাবায়ে কিরাগণ যখন ইসলামের পথে এসেছেন তখন সমাজে মুসলমানদের কোনো নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। ইসলামিক হুকুমতও ছিল না। আর বর্তমানের অবস্থাও অনুরূপ। অথচ মুসলমানদের এমন নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ইসলামিক রাষ্ট্রবিহীন এমন দূরাবস্থা (১৯২৪ সনের পূর্বে) ১৪শত বছরের ইতিহাসে আর কখনো হয়নি।

খ. সাহাবায়ে কিরামদেরকে যেমন তাঁদের সময়ে তাঁদেরকে বেষ্টন করে রাখা গোটা আরব উপদ্বীপ, তৎকালীন দুই শক্তিশালী পরাশক্তি রোমান ও পারস্য সম্রাজ্যসহ বহুবিধ শক্তির মোকাবেলা করতে হয়েছে, বর্তমান সময়েও এই একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঘরের শত্রু, বাইরের শত্রু সবাই মিলে আজ ইসলামের বিজয়কে রোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোমর বেঁধে লেগেছে। এমন নাজুক পরিস্থিতি (১৯২৪ সনের পূর্ব পর্যন্ত) আমাদের অতীত ইতিহাসে আর কখনো আসেনি। ভালো হোক মন্দ হোক মুসলমানদের কোনো না কোনো নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সত্যকে সাহায্য করার মতো একদল লোক সব সময়ই সমাজে পাওয়া যেতো। অন্ততঃ পক্ষে খারাপ পরিস্থিতি থেকে নিজের দ্বীন-ঈমানকে হিফাজত করার জন্য হিজরত করে যাওয়ার মতো কোনো না কোনো স্থান পাওয়া যেতো। বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্ব ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আর এই পরিস্থিতির মিল একমাত্র সাহাবায়ে কিরামদের পরিস্থিতির সাথেই পাওয়া যায়। আর এজন্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এই কঠিন পরিস্থিতিতে যাঁরা কাজ করবে তাঁদের প্রতিদানও বহুগুণ বেশি হবে। তাঁদেরকে নিশ্চয়ই

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অনেক বেশি পরিমাণ আজর বা বিনিময় দান করবেন এবং তাঁদের মর্যাদা অনেক উঁচু স্তরে তুলে দিবেন। আমরা একথা বলছি না যে এদের বিনিময় সাহাবায়ে কিরামদের সমান হবে; তবে এটা বলছি যে এদের বিনিময় অনেক উঁচু দরজার হবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের আকীদা হলো, মর্যাদার দিক থেকে এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম হলেন সাহাবায়ে কিরামগণ, তারপর তাবেঈন, তারপর তাবে তাবেঈন। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই হাদীসটিকেও মনে রাখতে চাই, যে হাদীসে তিনি বলেছেন,

فَإِنّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَاماً الصّبْرُ فِيهِنّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلعَامِلِ فِيهِنّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ". قال عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ: وَزَادَنِي غيرُ عُتْبَةَ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلاً مِنّا أَوْ مِنْهُمْ؟ قال: "لاَ، بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلاً مِنْكُمْ". (قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.)

অর্থ: "তোমাদের পর এমন একটি যুগ আসবে যখন ধৈর্য ধরে দ্বীনের উপর কেবল টিকে থাকাটাই হাতে আগুনের অঙ্গার নিয়ে থাকার মতো কঠিন হবে। সে সময়ে যারা (আল্লার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য) কাজ করবে তাঁদেরকে পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ বিনিময় দান করা হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ তাঁদের সমসাময়িক পঞ্চাশজনের সমপরিমাণ বিনিময় নাকি আমাদের পঞ্চাশজনের সমপরিমাণ বিনিময়?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের পঞ্চাশজনের সমপরিমাণ।" (তিরমিযী, হাদীস নং ৩১৫৫)

অতএব তাঁদের সালাত হবে পঞ্চাশজন সাহাবীর সালাতের সমান। তাঁদের সিয়াম হবে পঞ্চাশজন সাহাবীর সিয়ামের সমপরিমাণ। কেনো এতো বেশি বিনিময় দেয়া হবে? কারণ সে সময়টি হবে ভীষণ সঙ্কটময়। এ সময়টি হবে অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সঠিক ঈমান ও

সঠিক আমলের উপর থাকার কারণেই তাদের বিনিময় এতো বেশি দেয়া হবে।

আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের শেষ যামানায় এমন কিছু সৌভাগ্যবান মানুষের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন যাঁরা হবে তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى) يَخْرُجُ مِنْ عَدَنِ أَبْيَنَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً , يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هُمْ خَيْرُ مَنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ.

অর্থঃ "হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (দক্ষিণ ইয়েমেনের) আদনে আবইয়ান অঞ্চল থেকে বারো হাজারের একটি বাহিনীর আবির্ভাব হবে, তাঁরা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করবে এবং আমার ও তাঁদের সময়ের মধ্যে তাঁরাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।" (মুসনাদে আহমাদ, মু'জামুল কাবীর, তারীখুল কাবীর)

লক্ষ্য করুন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছেন! তিনি বলেছেন যে তাঁরা আল্লাহর রাসূল ও তাঁদের সময়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে তাঁরা আল্লাহর রাসূলের পর থেকে যতো যুগ, যতো শতাব্দী পরে হবে, তাঁর মধ্যে তারাই হবে শ্রেষ্ঠ। বিগত শতকসমূহের মাঝে তাঁরাই উম্মতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? কারণ হলো তাদের সময়টি সাহাবায়ে কিরামদের সময়ের মতোই জটিল ও কঠিন হবে। তাঁদেরকেও সেই একই ধরণের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে, যা সাহাবায়ে কিরামদেরকে করতে হয়েছিলো।

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জনের এই স্বর্ণালী সময় হাতে পেয়েও কেনো এতো অকারণ অভিযোগ?

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সময় অর্থনীতিতে এমন (বুম) স্ফিতি তৈরী হয়। যারা সে সময় একটু বুদ্ধি করে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য

সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে, যারা একটু রিস্ক নেয়ার সাহস দেখাতে পারে, তারা হঠাৎ করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মতো বিরাট বিত্তশালী ধনী হয়ে যায়। আবার যখন অর্থনীতিতে স্থবিরতা নেমে আসে, বাজারে মন্দা সৃষ্টি হয় তখন অনেকে আফসোস করতে থাকে যে আহ! ঐ সময়ে আমি একটু বুঝতে পারতাম, যদি একটু রিস্ক নিতাম, যদি সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারতাম, তাহলে আমিও তাদের মতো মিলিয়নার, বিলিয়নার হয়ে যেতাম। তখন মানুষ পরিতাপের সাথে ভাবে ও আশা করে, সুদিন ফিরে পেলে তারাও পূর্বসূরীগণের ন্যায় স্বচ্ছল হতে পারত।

হাসানাত ও আজর অর্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্পর্ক পরিস্থিতির সাথে। পরিস্থিতি যতো জটিল কঠিন হবে আজর ততো বেশি হবে। অতএব কেন এই সময় ও পরিস্থিতির ব্যাপারে অকারণ অভিযোগ? এটা তো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সব চেয়ে উত্তম সময়।

আমরা যেখানে এমন একটি সময়ের কথা বলছি, যখন বিজয় একান্ত নিকটবর্তী। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর করে যাওয়া ভবিষ্যতবাণী বাস্তবে প্রত্যক্ষ করছি- যাঁরা ইমাম মাহদীকে বিজয়ী করবেন, যাঁরা ঈসা আ. কে বিজয়ী করবেন। আমরা যদি মনে করি যে আমরা বহুল প্রতিক্ষিত, বহুল আকাঙ্খিত সেই সিদ্ধান্তকর সময় অতিক্রম করছি, আর তারপরও যদি আমরা বাস্তব ময়দানে কাজে অংশগ্রহণ না করি, যদি আমরা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করি, তাহলে আমাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। অতএব জান্নাত ক্রয়ের এই স্বর্ণালী মুহূর্তে কিছুতেই আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয় যখন অন্যরা জান্নাতের অনেক উঁচু মাকামগুলোতে নিজেদের জন্য বুকিং দিয়ে ফেলছে। আমাদের উচিত নয় শুধু অভিযোগ করে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা।

হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ان الله وقد زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وان أمتى سيبلغ ملكها مازوى لى منها.

অর্থ: "আল্লাহ্ আমার সামনে সমগ্র পৃথিবী তুলে ধরলেন, আমি এর পূর্ব হতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত অবলোকন করেছি। (তোমরা শুনে রাখো) নিশ্চিতভাবে আমার উম্মতের কর্তৃত্ব ততো দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, যতো দূর পর্যন্ত আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৮৯। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২২৯৪)

অতএব আমাদের বর্তমান অবস্থা যতো দূর্বলই হোক না কেন, সেদিন ইনশাআল্লাহ বেশি দূরে নয়, যেদিন এই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিটি নগর, মহানগর, দেশ মহাদেশের উপর এর প্রভাব বিস্তার করবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা প্রতিটি নগর মহা-নগরীতে স্বমহিমায় পতপত করে উড়বে। পৃথিবীর এমন প্রতি ইঞ্চি জায়গার উপর আল্লাহর এই দ্বীন বিজয় লাভ করবে, যেখানে দিন-রাতের আলো-আঁধার পৌছে।

এমন স্থান কি পৃথিবীর কোথাও আছে, যেখানে দিনের আলো পৌছায় না?
সুতরাং হে কাফির, মুনাফিকগণ!
তোমরা যদি এই দ্বীনের আলো থেকে নিজেদের লুকাতে চাও, তাহলে তোমাদেরকে এই পৃথিবীর বুক ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। সেই দিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন এই দুনিয়াতে তোমাদের জন্য এক ইঞ্চি জায়গাও থাকবে না, যেখানে গিয়ে তোমরা আত্মগোপন করবে।

বিজয় অতি নিকটে

আমরা দাবী করছি যে মুসলিম উম্মাহর বিজয় অতি সন্নিকটে। আসুন আমরা এখন আমাদের দাবীটি নিয়ে একটু পর্যালোচনা করি। আমরা আমাদের এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইতিপূর্বে উল্লেখিত মূলনীতিটিকে ব্যবহার করবো। আর সেই মূলনীতিটি ছিলো,

إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه.

অর্থ: "যখন আল্লাহ কোনো কিছু চান, তখন তিনিই তার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে দেন।"

প্রথমে আসুন আমরা এই মূলনীতিটি সঠিক কি না, তা ভালো করে বুঝে নেই। এই মূলনীতিটি যে একটি অকাট্য সত্য মূলনীতি তা বোঝার জন্য আমরা কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে তাকাবো। নিম্নে আমরা ইতিহাস প্রসিদ্ধ কতগুলো ঘটনা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করছি, আর এর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমাদের এই মূলনীতিটার বাস্তবতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে।

প্রথম উদাহরণ:

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত একটি হাদীস আছে যাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় দীর্ঘ ১৩ বছর দা'ওয়াহ্ দেন। সেখানে আশানুরূপ ফল না পেয়ে তিনি তায়েফে গমন করেন, কিন্তু সেখানেও তিনি বৈরী পরিস্থিতির শিকার হন।

তিনি প্রত্যেক বছর হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের কাছে দা'ওয়াহ্ দিতেন, বিভিন্ন গোত্রের সামনে নিজেকে (নিজের নবুওয়াতকে) উপস্থাপন করতেন এবং প্রত্যেক গোত্রের কাছে একটা বিশেষ সাহায্য চাইতেন। তিনি বলতেন, **"তোমরা আমাকে নুসরাহ দাও, যাতে আমি আমার রবের বাণী সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারি।"**

কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতো। কেউই তাঁর কথায় পুরোপুরি সম্মত হতে পারেনি।

আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছিলেন এই মহান কাজের সুবর্ণ সুযোগ অন্য কাউকে দিয়ে তাদেরকে ধন্য করতে। আর তাঁরা হলো মদীনার আওস ও খাজরাজ গোত্র। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে প্রস্তুত করেছিলেন?

আওস এবং খাযরাজ গোত্রদ্বয় দীর্ঘদিন যাবত একে অন্যের বিরুদ্ধে এক চরম রক্তক্ষয়ী অন্তহীন দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তারা প্রতিদিন জেগে উঠে যুদ্ধ করত। এ রকমই ছিল তাদের জীবন। যুদ্ধ করতে করতে তারা ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো। হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক যে যতো বড় যোদ্ধা ও বীর পুরুষই হোক না কেন, যদি সহ্যসীমার বাইরে চলে যায়, তবে তখন আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় না। এভাবেই এই যুদ্ধ এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিলো, যা তাদের পক্ষে আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। শেষমেষ তারা রণে ভঙ্গ দিল। এই অবস্থায় তাদের সামনে এলো 'ইয়াওমুল বুয়াস'।

হযরত আয়শা রা. এ প্রসঙ্গে বলেন, "এই বুয়াসের দিনটি ছিল এমন একটি সময় যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য একটি বিশেষ উপহার হিসেবে প্রদান করেছিলেন। অথচ বুয়াসের সাথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এটা ছিলো একান্তই মদীনার লোকদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আর সে সময়ে মদীনার সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এই বুয়াস যুদ্ধে আওস ও খাজরাজ একে অপরের উপর নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং শুধু সাধারণ মানুষই নয়, বরং তাদের উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রায় সবাই নিহত হয়। যার কারণে আওস ও খাজরাজ উভয় গোত্রই নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় সারির যেসব নেতারা বেঁচে ছিলেন তারাও কোনো না কোনোভাবে আহত ছিলেন।

আপনি যদি একটু মনোযোগ সহকারে কুরআনে বর্ণিত নবীদের ইতিহাস পড়ে থাকেন তাহলে দেখতে পাবেন যে যুগে যুগে আল্লাহর নবীদের বিরোধিতায় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তারা সকলেই প্রায় একটি বিশেষ শ্রেণীর হয়ে থাকে। কুরআনে তাদেরকে 'মালা' নামে অভিহিত করা

হয়েছে। আর 'মালা' বলা হয় সমাজের নেতৃস্থানীয়, প্রভাবশালী লোকদেরকে। হতে পারে সে নেতৃত্ব রাজনৈতিক, হতে পারে অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক। এই নেতৃস্থানীয় লোকেরাই যুগে যুগে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আল্লাহর নবীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো।

এর কারণ হলো তারা জানে যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এদের ক্বায়েমী স্বার্থই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারা জানে যে তারা যে শোষণের সমাজ কায়েম করে রেখেছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সেখানে কায়েম করবে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ। তারা জানে যে নবীদের আগমনই হলো নেতৃত্ব কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হাতে অর্পণ করার জন্য। যার কারণে তারা সমাজে তাদের যে একটি বিশেষ মর্যাদা বা স্ট্যাটাস কায়েম করে রেখেছে তা আর থাকবে না। ইসলামের সমাজে সকল মানুষ এক আল্লাহর বান্দা বা গোলাম হিসেবে সমান মর্যাদা লাভ করবে এবং সমাজে খিলাফাহ ব্যবস্থা কায়েম করা হবে শুধু আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠির মনগড়া বিধানের কোনো স্থান এই সমাজে থাকবে না বরং মানবরচিত আইনের নোংড়া জঞ্জালকে সেই সমাজ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে।

একারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আবূ বকর রা. বা উমর রা. তাঁদের কাউকেই তাঁদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠির স্বার্থের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়নি। বরং তাঁদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো কেবল আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য। একটি পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজে কেউ কখনো নেতৃত্ব কর্তৃত্বের লোভী হয় না। কারণ তাঁরা সবাই জানে যে নেতৃত্ব কর্তৃত্ব এমন এক বোঝা যা বহন না করাই ভালো। যার দায়িত্ব যতো বেশি থাকবে, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর বিচারের দরবারে ততো বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। যার কারণে একজন সঠিক ঈমানদার কখনো আগ বাড়িয়ে দায়িত্বের বোঝা নিজের কাধে তুলতে চায় না। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেককে খিলাফতের দায়িত্ব জোর করে

দেয়া হয়েছিলো। তাঁরা কেউই এই দায়িত্ব নেয়ার জন্য লালায়িত ছিলেন না। আবূ বকর রা. চাচ্ছিলেন উমর রা. কে বাইআত দিতে। কিন্তু উমর রা. জোর করে আবূ বকর রা. কে বাইআত নিতে বাধ্য করেন।
আবূ বকর রা. ইন্তেকালের সময় জোর করে উমর রা. এর উপর খিলাফাতের দায়িত্ব হস্তান্তর করে যান। উমর রা. যখন মুমূর্ষ অবস্থায় তখন লোকেরা তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে খিলাফাতের দায়িত্ব দিতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, 'আমি চাই না কিয়ামতের দিন আমার পরিবার থেকে দুইজন এতো বড় বোঝা কাঁধে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হোক।'

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে, যুগে যুগে ফিরআউন, ক্বারুণ, আবূ জাহেল ও আবূ লাহাবদের মতো নেতৃস্থানীয় লোকেরাই ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো। এরাই হলো সেই সমস্ত লোক যারা নেতৃত্বের অপব্যবহার করে অর্থবিত্ত, পদমর্যাদা, খ্যাতি ইত্যাদির অধিকারী হয়ে দম্ভ দেখিয়ে বেড়ায়। এরাই তাদের সামাজিক অবস্থান ধরে রাখার জন্য ইসলামের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান হারানোর ভয় তাদেরকে সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায়।

তবে হ্যাঁ, লোকেরা যদিও তাদেরকে অনেক ক্ষমতাশালী ও মুক্ত স্বাধীন মনে করে, কিন্তু বাস্তব অর্থে তারা কিন্তু মোটেও মুক্ত স্বাধীন নয়। তারা মানুষের গোলাম। তারা লোভের গোলাম। তারা খ্যাতির গোলাম। তারা বিত্তের গোলাম। সর্বোপরি তারা কু-প্রবৃত্তির গোলাম। কারণ মানবরচিত মূল্যবোধ ও বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করে কোনো মানুষ কখনো সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে পারে না, সে অসংখ্য প্রভুর গোলামীর জিঞ্জিরে বন্দি হয়ে থাকে।

একারণেই আমরা দেখতে পাই যখন রাবিয়া ইবনে আমীর রা. পারস্য সম্রাজ্য আক্রমণের জন্য গিয়েছিলেন তখন পারস্য সম্রাট তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কেন আমাদের দেশ আক্রমণ করতে এসেছো? তোমরা যদি অর্থ-বিত্তের জন্য আক্রমণ করে থাকো, তাহলে বলো, আমরা

তোমাদের প্রত্যেককে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ দিবো, তারপরও তোমরা চলে যাও। রাবিয়া ইবন আমীর রা. বলেন, আমরা এখানে অর্থ-বিত্তের জন্য আসিনি। আমরা এসেছি মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ করতে। ধর্মের নামে প্রচলিত অন্যায় অবিচারের হাত থেকে মুক্ত করে ইসলামের ন্যায়-ইনসাফ কায়েম করতে। দুনিয়ার সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে মুক্ত করে মানুষকে আখিরাতের দিগন্ত বিস্তৃত বিশালতার জগতে পদার্পণ করাতে। ধর্মের নামে যে জুলুমের বেড়াজাল তৈরী হয়েছে তা ছিন্ন করে ইসলামের ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রেরণ করা হয়েছে। আমরা মানুষকে এই দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে এই পৃথিবী ও আখিরাতের বিশালতায় নিয়ে যেতে চাই।”[২]

খেয়াল করুন, রাবিয়া ইবন আমীর রা. ধর্মতত্ত্বের ছাত্র ছিলেন না, তা সত্ত্বেও অন্যান্য সকল ধর্মের জুলুম তথা অবিচারের কথা বললেন। অন্য সকল ধর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন ছিল না, কারণ ওহীর জ্ঞান দ্বারা তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন যে, কেবল ইসলাম-ই ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, বাকি সকল ধর্মই জুলুমের খোলস পরে আছে। ইসলামই মানবজাতিকে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ উপহার দিতে পারে।

বুয়াস যুদ্ধ মূলত: মদীনার জনগণকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করেছে। নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামের ভবিষ্যত ভূখণ্ড হিসেবে বুয়াস যুদ্ধ মদীনাকে প্রস্তুত করেছে। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আনসাররা হজ করতে মক্কায় এসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের সংবাদ শুনে তাঁরা বলেছিলো, ‘চলো আমরা এই ব্যক্তিকে আমাদের দেশে

---

[২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সপ্তম অধ্যায়, কাদেসিয়া যুদ্ধ।

নিয়ে যাই। হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে আমাদেরকে আবার ঐক্যবদ্ধ করে দিবেন।'

তাঁরা তাঁদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে হারিয়ে সত্যিই বড় অসহায় হয়ে পড়েছিলো। তাঁরা তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব বোধ করছিলো। আসলেই মানব জাতির জন্য নেতৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নেতৃত্ব ছাড়া মানবতা টিকে থাকতে পারে না; ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব প্রয়োজন। কল্যাণকর কাজের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য হোক বা মন্দ কাজের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য হোক, নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। নেতৃত্ব থাকতেই হবে। শয়তানের দলেরও নেতা থাকে। আর আল্লাহর দলেরও নেতা থাকে। এটা মানুষের স্বভাবধর্ম। পথ প্রদর্শনের জন্য সে সব সময়ই নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী।

মদীনার লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে প্রস্তুত করেছিলেন। এর অন্যতম আরেকটি দিক হলো মদীনার লোকদের কাছেই ইহুদীরা বসবাস করতো। আর তাদের কাছ থেকে তারা একজন নবীর আগমনের কথা দীর্ঘ দিন থেকে শুনে আসছিলো, যার কারণে তাদের কাছে নবী আগমনের বিষয়টি এতোটাই স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়, যা আরব উপদ্বীপের অন্যদের সামনে ছিলো না। অন্যদের কাছে নবী আগমনের বিষয়টি এতোটা আলোচিত বিষয়ও ছিলো না।

মদীনার আনসারদেরকে ইহুদীরা বিভিন্ন সময় এই বলে হুমকি দিতো যে, "শীঘ্রই আমাদের মাঝে একজন নবী আসবেন এবং এরপর আমরা তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবো, যেভাবে আদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছিলো।"

অথচ আমরা দেখতে পাই যে, নবী ঠিকই এসেছেন কিন্তু স্বভাবের গোয়ার্তুমী আর মনের বক্রতার কারণে সেই ইহুদীরাই হিদায়াত পেলো না, যারা সেই নবী আগমনের খবর অন্যদেরকে শুনাতো।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চাইলেন মদীনার আনসাররা ইসলাম গ্রহণ করুক এবং তাঁর নবীর সাহায্যকারী হোক। আনসাররা বুয়াস যুদ্ধে প্রাণপন লড়াই করছিলেন ঠিকই কিন্তু তারা কি ঘূণাক্ষরেও জানতেন যে এই যুদ্ধ

কিভাবে তাদেরকে ইসলামের নিকটবর্তী করতে যাচ্ছে। বুয়াসের যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণভাবেই একটি জাহেলিয়াতের যুদ্ধ, কিন্তু তা তাঁদের আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ধাবিত করছিল। সবার অজান্তেই এ যুদ্ধ তাঁদেরকে আল্লাহর নিকটতম প্রিয় বান্দা হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন রকম অবস্থা তৈরী করেন, যার অন্তর্নিহিত রহস্য হয়তো মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না।

দ্বিতীয় উদাহরণঃ

এটি দ্বিতীয় খলীফা হযরত যখন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর সময়ের ঘটনা। তিনি পারস্য সাম্রাজ্যে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি এই মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন আবূ উবায়দা আস সাকাফী রা. কে। সেনাপতি আবূ উবায়দা আস সাকাফী রা. ছিলেন অত্যন্ত অকুতোভয় ও অসীম সাহসী বীর যোদ্ধা। তবে ঘটনাক্রমে তিনি এই যুদ্ধে এমন কয়েকটি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেন যা না নিলেও চলতো। আর এই মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকির কারণে জিসর বা সেতু যুদ্ধে মুসলমানদের ভাগ্যে এক পর্যায়ে পরাজয়ের গ্লানী নেমে আসে। সেদিন মুসলিম বাহিনীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যক সৈন্য শহীদ হয়ে যায়।

পারস্য বাহিনী তখন ভাবছিলো যে, বাকি মুসলিম বাহিনীকে নির্মূল করে দেয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। আর যুদ্ধের ফলাফল নিশ্চিতভাবে তাদের অনুকূলেই যাবে। তারা ভাবছিলো, মুসলমানরা যেসব এলাকা ইতিপূর্বে দখল করে নিয়েছিলো এবার তাঁদেরকে সে সব এলাকা থেকেও উৎখাত করে দিতে তারা সক্ষম হবে।

বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ আত্-তারীখুল ইসলামীর লেখক জনাব মাহমুদ শাকির বর্ণনার এ পর্যায়ে এসে লিখেছেন, "কিন্তু ঈমানদারদের সাথে রয়েছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। ঈমানদাররা যদি বিজয়ের শর্তগুলো সঠিকভাবে পূরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাই তাদেরকে বিজয় দান করবেন, তা যেভাবেই হোক না কেন। তাতে তাঁদের সৈন্য সংখ্যা বিশাল হোক বা না হোক। তাঁদের কাছে পারমাণবিক বোমা

থাকুক বা না থাকুক। এ সকল উপায়-উপকরণ এমন কোনো বিষয় নয়, যা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঈমানদাররা যদি ঈমানের দাবী মোতাবেক তাঁদের দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে, তাহলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বিজয় দান করবেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ.

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞদেরকে মোটেই ভালোবাসেন না।" (সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৮)

আল্লাহ তা'আলা একথা বলেন নি যে, তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন, যাদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে, যারা সংখ্যায় অনেক। বরং তিনি তাঁদেরকে রক্ষা করার কথা বলেছেন যাঁদের ঈমান আছে, আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য এটাই হলো শর্ত যা আমাদেরকে পূরণ করতে হবে। তাই বাহ্যিক অবস্থা দেখে যদিও মনে হচ্ছিলো যে মুসলমানরা এ যুদ্ধে হারতে যাচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে রাত পোহাতে না পোহাতেই বিজয়ের পাল্লা মুসলমানদের দিকে ঝুঁকে পড়লো।

যখন যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানরা একেবারে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলো, ঠিক তখনই পারস্য সম্রাজ্যের রাজধানীতে আল্লাহ তা'আলা এক বিপর্যয় ঘটিয়ে দিলেন। পারস্য সম্রাজ্যের দুই প্রধান নেতা একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। যার ফলে সেনাবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে অর্ধেক সেনাপতি রুস্তমের পক্ষ নেয় আর বাকী অর্ধেক সম্রাটের পক্ষ নেয়।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত বাহিনীর দায়িত্বে থাকা সেনাপতিকে রাজধানীতে জরুরীভাবে তলব করা হয়। সেনাপতি রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। আর এই সময়টুকু মুসলমানদের জন্য হয়ে দাঁড়ায় একটি সুবর্ণ সুযোগ। খলীফাতুল মুসলিমিন উমর রা. পর্যাপ্ত সময় পেয়ে যান দ্রুত সৈন্য পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণের।

আলোচ্য ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, ঠিক সেই মুহূর্তেই আল্লাহ তা'আলা পারস্য সম্রাজ্যের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ লাগিয়ে দিয়েছেন, যখন মুসলিমদের জন্য তা দরকার ছিলো। আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছিলেন সেই এলাকায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন হোক। আর এদিকে মুসলিমরাও তাঁদের ঈমানী দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলো। তাই যেখানে দেখা যাচ্ছিলো যে মুসলিমরা পরাজয়ের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে, সেখানে সেই অবস্থা পরিবর্তন করে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করলেন।

তৃতীয় উদাহরণ:

এই উদাহরণটি আমরা নেবো ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস থেকে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়ার কারণে মুসলমান শাসকরা যখন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো, তখন পবিত্র ভূমি রক্ষার জন্য সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. মুসলিমদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করলেন। পবিত্র ভূমির আশপাশের মুসলিমদের সংঘবদ্ধ করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে মনস্থ করলেন। অথচ তাঁর পূর্বে কোন মুসলিম নেতাই এ ব্যাপারে সাহসী উদ্যোগ নিতে পারেনি। কাপুরুষ শাসকরা কাফিরদের ভয়ে চরমভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। অথচ কাফিররা শামের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও জেরুজালেমসহ গোটা সমূদ্র উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ দখল করে নিয়েছিলো।

সালাহ্ উদ্দিন আইউবী রহ. এর এই প্রস্তুতির খবর যখন ক্রুসেডাররা শুনলো তখন তারা বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলো। কারণ তারা জানতো যে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে। তারা জানতো যে সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. কোনো সাধারণ ব্যক্তির নাম নয়।

এদিকে মুসলমানদের মধ্যকার কিছু আলিম-উলামা ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা আরম্ভ করলো দু:খজনক বিরোধীতা। তারা সালাহ উদ্দীনকে অতি উৎসাহী বলে তাঁর কঠোর সমালোচনা শুরু করলো। রোম সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণাকে তারা 'পাগলামো' বলে সালাহ্ উদ্দীন আইউবী রহ. কে তিরস্কার করতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো যে, রোম এতো বড় এক বিশাল সম্রাজ্য, যাকে বলা যায় কূল-কিনারাহীন সমূদ্র। তারা রোম সম্রাজ্য ও ইউরোপকে এতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলো যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা তারা চিন্তাই করতে পারছিলো না। তারা চিন্তা করছিলো যে, গোটা ইউরোপ তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, আর অন্য দিকে মুসলিমরা হলো শতধাবিভক্ত। অতএব এমন একটি বিভক্ত জাতি নিয়ে বিশাল সামরিক শক্তিধর ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়ার অর্থ হলো মুসলমানদেরকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়া।

কিন্তু সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র উপর তায়াক্কুল করে এগিয়ে চললেন। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের থেকে মুসলমানদের ভূখন্ড পুনরুদ্ধার করার অভিযান আরম্ভ করেন। উম্মতের সামান্য কিয়দাংশ নিয়েই তিনি যুদ্ধ করছিলেন।
এই অবস্থা দেখে পোপ গোটা ইউরোপকে আর একটি নতুন ক্রুসেডের জন্য সংগঠিত করতে আরম্ভ করে, যেটা ৪র্থ ক্রুসেড এবং এটা ছিলো সর্ব বৃহৎ ক্রুসেড। কারণ এটি ছিলো সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. এর বিরুদ্ধে।

মুসলিমদের সামরিক নেতৃত্বে এবার সালাহ উদ্দীন রহ. কে দেখে এই যুদ্ধকে খৃষ্টানরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিলো এবং তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং সেনা নায়ক নিয়োগ দেখেই বোঝা যায় যে তারা এই যুদ্ধকে কেমন গুরুত্ব দিয়েছিলো। আমরা দেখতে পাই যে এই যুদ্ধে তারা কোনো জেনারেলদের উপর দায়িত্ব না দিয়ে স্বয়ং তাদের শাসক রাজা-বাদশারা নিজেরা যুদ্ধের ময়দানে এসে সরাসরি নেতৃত্ব দেয়া শুরু করেছিলো। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির রাজা নিজেরা সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বেড়িয়ে পড়েছে এবং তারা নিজ নিজ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছে। ইংল্যান্ড, জার্মানী ও ফ্রান্স যখন একই সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে তখন তাদের সেনাবাহিনীর আকার এতো বিশাল হয়ে দাঁড়ায় যা তৎকালীন সময়ের

প্রেক্ষাপটে অস্বাভাবিক ধরণের এক বিশাল সেনাবাহিনী হিসেবে আবির্ভুত হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় শুধু জার্মান কিং ফ্রেডরিক বার্বারোজ একাই তিন লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করে। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে তিন লক্ষ সৈনের কোনো বাহিনীর কথা শুনলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এমনিতেই যে কোনো মানুষ মূর্ছা যাওয়ার কথা। সম্মিলিত ইউরোপিয়ান বাহিনী এতো বিশাল আকার ধারণ করে যে, তাদের নৌ-বাহিনীর জাহাজ এবং ইউরোপিয়ান বাণিজ্যিক জাহাজগুলো দিয়েও তাদেরকে বহন করে আনা সম্ভব হচ্ছিলো না। তাই ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের সৈন্যরা নৌ-জাহাজে যাত্রা করলেও জার্মান বাহিনীকে স্থল পথে যাত্রা করতে হয়।

এবার আসুন আমরা একটু জেনে নিই ঐ সময়ে তৎকালীন মুসলিম সমাজের তথাকথিত কতিপয় আলেম-উলামাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিলো এবং তারা কি ভূমিকা পালন করেছিলেন।
ঐতিহাসিক ইবনে আসীর রহ. বলেন, "ইউরোপীয়ানরা নৌপথ ও স্থল পথে এগিয়ে আসছিলো মুসলিদের উপর আক্রমণ করতে। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়লো যে শুধু জার্মান কিং একাই তিন লক্ষ দুর্ধর্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে উত্তর সীমান্ত দিয়ে এগিয়ে আসছে। আলেম-উলামাদের অনেকেই প্রথমে নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিলেন যে তারা শাম অঞ্চলে গিয়ে শত্রুদের মোকাবিলায় আল্লাহর পথে জিহাদ করবেন। কিন্তু পরক্ষণে তারা যখন নিশ্চিতভাবে ইউরোপীয় বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তাদের অনেকেই পিঠ টান দিয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে ফিরে আসলেন।"

এখানে প্রশ্ন হলো তারা কেন পিছু হটে ছিলেন? সংখ্যা বেশি হলে কি ফিক্বহের পরিবর্তন হয়? তারা জিহাদের নিয়্যতে বের হয়েছিলেন, পরে সংখ্যাধিক্যের কারণে ফিরে যান, অথচ তারা ছিলেন আলেম। এখানে একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে আর তা হল আলেমগণ নিষ্পাপ, মাসুম বা ভুলের উর্ধ্বে নন। তাঁরা আম্বিয়াও নন। আলেমগণ মানুষের মধ্য থেকেই এসেছেন। তারা কখনো হকের উপর থাকবেন, আবার কখনো হকের পথ

থেকে বিচ্যুতও হয়ে যেতে পারেন। একারণেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে, মানুষ অন্ধভাবে আলেমদের পিছনে ছুটলে সব সময়ই তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। তবে এটা আবশ্যক নয় যে একেবারে সব আলিমগণ হক থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবেন। কিছু আলেমদের ক্ষেত্রে এটি হতে পারে, সকল আলিমগণের ক্ষেত্রে নয়।
ইবনে আসীর রহ.ও কিছু সংখ্যক আলিমদের পেছনে ফিরে যাবার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, তাদের বিরাট একটি অংশ ময়দান ছেড়ে চলে এসেছিলো। তবে একটি অংশ সর্বদাই অটল ছিলো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হযরত সাওবান রা. এর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ.

অর্থঃ "এই উম্মাহর মধ্যে সব সময়ই এমন একটি তা'ইফা (দল) থাকবে, যারা হকের উপর অটলভাবে টিকে থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ।)

ঘটনা হলো সাধারণ জনগণের অনেকেই নিজেদের বিবেক দিয়ে তাদের দায়িত্ববোধ উপলব্ধি করতে পারলেও অনেক সময় দায়িত্ব এড়ানোর জন্য তাদের বিবেক বোধকে হকের পথ থেকে বিচ্যুত কতিপয় আলেমদের সাথে জুড়ে দেন। তারা বলতে বলতে থাকেন যে 'আমাদের আলেমরা তো এই কথা বলেন না।'
এমনও অনেক লোক আছে যারা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেতে আলেমগণের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলে যে, 'অমুক আলেম এরূপ কোন ফাতওয়া দেননি, অমুক আলিম জিহাদে যেতে বলেন নি।' অর্থাৎ তারা আলেমগণকে দোষারোপ করে, যদিও এমন অনেক উলামায়ে কিরাম রয়েছেন যারা ঐ মতের বিপরীতে সত্য তুলে ধরেছেন।

আর কুফর নিয়ন্ত্রিত সমাজে হকপন্থী আলিমদের অতোটা নাম-ডাক না থাকার কারণে তাদের কথা জনগণকে সঠিকভাবে জানতেও দেয়া হয় না। তাদেরকে হয় ত্বাগুতরা হত্যা করে ফেলে, অথবা তাদেরকে কারারুদ্ধ করে

রাখে, অথবা তাদেরকে গোপনে লুকিয়ে থাকতে হয়। তারা তো কেউ কুফুরী সমাজে বিখ্যাত হতে পারেন না। কারণ তাদের খুৎবা রেডিও টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয় না। আর বর্তমান যুগের এক মারাত্মক ফিৎনা হলো যে আজকাল কে কতো বড় আলেম, তা মাপা হয় নাম জশ ও খ্যাতি দিয়ে। যে যতো বেশি বিখ্যাত সে ততো বড় আলেম। অথচ এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য মানদন্ড নয়।

একটা সময় ছিলো যখন সত্যিকার ইলম এবং উস্তাদদের প্রত্যয়নই ছিলো আলিম হওয়ার মানদন্ড। পূর্বে আলেমগণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাউকে আলেম রূপে গণ্য করা হত। শিক্ষক বা উস্তাদ প্রশিক্ষণ দান শেষে ছাত্রকে আলেম হিসেবে ঘোষণা দিতেন। অধিকাংশ আলেমগণের মতে যে সর্বাধিক ইলম সম্পন্ন সেই ফতোয়া প্রদানের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হত। কিন্তু কালের বিবর্তনে এ পদ্ধতি আজ প্রায় উঠেই গেছে। এখন সরকারীভাবে আলেমদের নিয়োগ দেয়া হয়। এখন কেউ আলেমগণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তে নয় বরং সরকারী নির্দেশে সহসাই পোষ্যআলেমে পরিণত হয়। এখন সরকারী নিয়োগের কারণে রাতারাতি অনেক ব্যক্তি বিখ্যাত আলেম হয়ে যায়। যে যতো বড় সরকারী পোষ্টে আছে, যাকে যতো বেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায় সে ততো বড় আলেমে পরিণত হয়। স্যাটেলাইট চ্যানেল ও রেডিও স্টেশনে বিভিন্ন প্রোগ্রামে আবির্ভূত হয়ে বিখ্যাত আলেম হিসেবে ব্যাপক পরিচিত লাভ করে। অথচ এমন পদ্ধতিতে সাধারণতঃ আপোষকামী ও দুনিয়ার বিনিময়ে দীন বিক্রিকারী ব্যক্তি ব্যতীত কারো পক্ষেই বিখ্যাত আলেমের খেতাব পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদেরকে এই ধোঁকার পিছনে পড়লে চলবে না। আমাদেরকে হকের কথা বলতে হবে এবং হকের কথা শুনতে হবে। তা যেখানেই থাকুক না কেন।

আসুন মূল ঘটনায় ফিরে যাই। ইবনে আসীর রহ. বলেন, শত্রুদের সংখ্যা শুনে আলেমদের অনেকেই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু তারা যেহেতু আলেম ছিলেন, তাই তারা তাদের পলায়নের বৈধতার জন্য অজুহাত ও দলীল খুঁজতে লাগলেন। আর তাদের জন্য তো দলীলের

কোনো অভাবও হয় না। কারণ তারা জানেন আল্লাহর আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের অর্থ কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় এবং কিভাবে নিজের মনগড়া কাজকে শরীয়তের মানদন্ডে বৈধতা দিতে হয়। তারা যেহেতু আলেম তাই তারা কখনোই তাদের অন্তরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া শত্রুদের ভয়ের কথা প্রকাশ করবেন না, নিজেদের দূর্বলতা প্রকাশ করে তারা কখনোই বলবেন না যে, 'আমরা কাপুরুষ, তাই আমাদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়।'
বরং কুরআন ও হাদীসের অপব্যখ্যা করে নিজেদের দূর্বলতাকে গোপন করার জন্য হয়তো বলবে, "এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াটা উম্মাহর বর্তমান অবস্থায় হিকমাহর খিলাফ। এর মাঝে কোন বিচক্ষণতা নেই।"
কিংবা "সালাহ্ উদ্দীন একজন অবুঝ, আমরা তাকে বারবার নিষেধ করার পরও সে আমাদের কথা শুনছে না। তাছাড়া সালাহ উদ্দীনের নেতৃত্ব মেনে নেয়া যায় না, কারণ সে তো বড় কোনো আলেম নয়। সে তো ভালো করে আরবী বলতে পারে না। কে তাকে অধিকার দিয়েছে সুতরাং শক্তিধর প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় নেমে এতো বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং উম্মাতকে এতো বড় বিপদের মধ্যে ফেলার? তার উচিত আলেমদের কাছে এসে আগে ফতোয়া নেয়া, কিন্তু সে তা করেনি। অতএব, সে তার একা গিয়ে যুদ্ধ করে মরুক।"
-এসব কথা বলে আলেমদের একটি বড় অংশ চলে গেলো।

কিন্তু কি হলো তারপর?
এর পরের ঘটনাও আমরা সবাই জানি। মূলত: এটা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। এটি ছিলো আলেমদের জন্য একটি পরীক্ষা, সালাহ্ উদ্দীনের জন্য এবং গোটা উম্মতের জন্যও একটি পরীক্ষা।

একদিকে ইউরোপের বিশাল বাহিনী মুসলিমদেরকে সমূলে উৎখাত করার জন্য ধেয়ে আসছিল, আর অন্য দিকে মুসলিমদের মধ্যে চলছিলো ফতোয়াবাজি আর অনৈক্যের প্রচন্ড ঝড়। সবশেষে মুসলমানদের একদল বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে গেলো আর স্বল্প সংখ্যক হলেও একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য অটল অবিচলভাবে সামনে এগিয়ে গেলো। ঠিক

যেমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বনী ইসরাইলদেরকে সমূদ্রের সামনে এনে পরীক্ষা করেছিলেন। এটা ছিলো মুমিনদের জন্য একটি পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা সব সময়ই মুমিনদেরকে এভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি কোনো মুমিনের ধ্বংস চান না, তিনি শুধু পরীক্ষার মাধ্যমে সত্যিকার ঈমানদাদেরকে বাছাই করে মুনাফিকদের থেকে আলাদা করে নেন।

আমরা জানি যে যখন হযরত মূসা আ. নীল নদের সামনে এসে পৌছলেন তখন কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো! সামনে নীল নদ আর পেছনে ফিরাউনের বাহিনী দেখে বনী ইসরাইলরা তখন হযরত মূসা আ. এর সামনে এসে বলতে লাগলো,

"তুমি আমাদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলে, তুমি বলেছিলে যে, আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করবেন, হিফাজতে রাখবেন। আর আমরা এখন মৃত্যুর সম্মুখীন। আমাদের সামনে সমুদ্র আর পিছনে ফেরাউনের বাহিনী। বের হবার কোন পথ নেই। অথচ মৃত্যু ছাড়া তো এখন আর আমাদের কোনো উপায় নেই। সামনে নীল নদ আর পেছনে ফিরাউনের বাহিনী। সুতরাং এখান থেকে আমাদের বাঁচার আর কোনো উপায় নেই।"

এই কঠিন অবস্থায় মূসা আ. কি জবাব দিয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামের মাধ্যমে আমাদেরকে সেই অসাধারণ ঐতিহাসিক জবাবটি জানিয়ে দিয়েছেন। মূসা আ. বলেছিলেন,

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

অর্থ: "(মূসা) বললেন, কখনই নয়, নিশ্চয়ই আমার রব আমার সাথে আছেন, তিনি আমাকে অচিরেই পথ দেখাবেন।" (সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত ৬২)

অটল অবিচল সত্যিকার ঈমানের কি অসাধারণ বহি:প্রকাশ! সামনে নীল নদ, পেছনে ফেররাউনের বাহিনী স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও যেন তিনি বলছেন, "আমি আমার চোখকে অবিশ্বাস করি, যখন সামনে সমুদ্র ও পেছনে ফেরআউনের বাহিনীকে দেখি। আমি আমার কানকে অবিশ্বাস করি যখন বনী ইসরাঈল আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে। আমি কেবল

আমার আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ঈমানে আস্থা রাখি। যেহেতু মহান আল্লাহ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই তা পূরণ করবেন। বাহ্যিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেনো, তাতে কিছু যায় আসে না।

এভাবে তিনি যখন ঈমানের পরীক্ষায় পাশ করলেন তখন মহান আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন তাঁর লাঠি দিয়ে নীল নদের পানির উপর আঘাত করতে। এরপর কি হয়েছিলো তা আমাদের সবারই কম বেশি জানা আছে। এভাবে মহান আল্লাহ বনী ইসরাইলকে যাচাই করে নিলেন যে কে তাদের মধ্যে ঈমানের প্রশ্নে অটল অবিচল, আর কার ঈমান ঠুনকো, শুধু মৌখিক দাবী।

সালাহ্ উদ্দীন আইউবীর সময়ও এই একই ঘটনা ঘটলো। এটা ছিলো ঈমানের পরীক্ষা। পরীক্ষার মাধ্যমে ঈমানদার আর ঈমানের ভূয়া দাবীদারদেরকে আল্লাহ তা'আলা যখন আলাদা করে নিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতেই মুসলিমদেরকে বিজয় দান করলেন। ফ্রেডরিক বার্বারোজ যে তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে রওয়ানা দিয়েছিলো তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে শায়েস্তা করলেন, আসুন আমরা দেখে নিই।

তাদেরকে পথিমধ্যে এমন একটি নদী পার হতে হলো, যে নদীতে বরফ গলা পানি প্রবাহিত হচ্ছিলো যার কারণে পানি ছিলো প্রচন্ড ঠান্ডা। একদিকে প্রচন্ড গরম আবহাওয়া, অপর দিকে প্রচন্ড ঠান্ডা পানি। সব মিলিয়ে ক্রুসেডার সেনাবাহিনী এক মহা বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়লো। আর তাদের সেনাপতি ফ্রেডরিক বার্বারোজ ছিলো সত্তোরোর্ধ বয়সের বৃদ্ধ। লৌহবর্ম দিয়ে তার শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত ছিলো। আসলেই কাফিররা কখনো মুসলিমদের মতো হালকা সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধ করতে সাহস পায় না। ঠিক যেভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ.

অর্থ: "ওরা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। ওরা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে। তারা নিজেরা নিজেদেরকে প্রবল শক্তিধর মনে করে; তুমি তাদেরকে

ঐক্যবদ্ধ মনে করছ অথচ তাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন। এটি এজন্য যে, তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ১৪)
হতে পারে এই দূর্গ-বাঙ্কার, অত্যাধুনিক কোনো ট্যাংক বা আর্মার্ড ভেহিকল বা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত কোনো যুদ্ধ বিমানের ককপিট। একবার তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত জায়গা থেকে বের করে আনতে পারলে হয়েছে। ব্যাস। তাদের অবস্থা একেবারে শেষ।

একারণেই ইমাম ইবনুল কাইউম রহ. বলেন, আকার আকৃতিতে সাহাবায়ে কিরামগণ তাদের শত্রুতের চেয়ে বিশাল বড় কিছু ছিলেন না, তাঁদের সামরিক ট্রেনিং তাদের চেয়ে উন্নত ছিলো না, তাঁদের যুদ্ধাস্ত্র, সাজ সরঞ্জাম তাদের চেয়ে কখনোই বেশি ছিলো না। বরং সব সময়ই কম ছিলো। কিন্তু তাঁদের ছিলো বিশাল এক অন্তর। ছিলো অন্তরের অটল অবিচল ধৈর্য ও সাহসিকতা। যা যুদ্ধের সব চেয়ে বড় ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র। কাফিরদের সেই অন্তর, সেই প্রধান অস্ত্র তখনই বিকল হয়ে যায়, যখন তার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি। সাহাবায়ে কিরামদের সাহস ও ঈমানের চেতনায় শত্রুপক্ষ হেরে যেত।

সাহাবায়ে কিরামদের বিশাল হৃদয়, অবিচল ধৈর্য্য ও সাহসিকতা ছিলো। তাঁরা জীবনের চেয়ে আল্লাহর পথে মৃত্যুকে বেশি ভালোবাসতেন। পক্ষান্তরে কাফিরদের জন্য এই শক্তি অর্জন কখনই সম্ভব নয়। কারণ তারা সব সময়ই জীবনকে সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসে আর মৃত্যুতে চরম ভয় পায়। তাই মুসলমানদের মতো সাহসিকতা তারা কখনোই অর্জন করতে পারে না। চাই তাদের সাজ সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ও ট্রেনিং যতেই উন্নত হোক না কেন। যুদ্ধ জয়ের আসল অস্ত্র অর্জন করা কখনোই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র, বর্ম, প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী অর্থাৎ বিজয়ের সব উপকরণই কাফিরদের মজুদ থাকলেও মনোবলের অভাবেই ওরা হেরে যেত।

ফ্রেডরিক বার্বারোজ ঘোড়ায় চড়ে অল্প পানির একটি খাল পার হচ্ছিল আর হঠাৎ কেন যেন তার ঘোড়াটি অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখে ভয় পেয়ে

লাফানো শুরু করলো। ফলে ফ্রেডরিক বার্বারোজা ঘোরা থেকে ছিটকে পানির মধ্যে পড়ে গিয়ে হার্ট এ্যাটাক করে সেখানেই মারা গেলো।
ইমাম ইবনে আসীর রহ. তার মৃত্যুর ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, জার্মান কিং ফ্রেডরিক সামান্য হাটু পানিতে ডুবে মারা গেলো। অথচ ফ্রেডরিক বার্বারোজ ছিলো এমন একটি নাম যা শুনলে গোটা দুনিয়ার মানুষের হৃদয়ে কম্পন শুরু হয়ে যেতো। যে ছিলো ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী বীর যোদ্ধা ও প্রতাপশালী শাসক, আল্লাহ তাকে সামান্য হাটু পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন।

জার্মান কিং এর মৃত্যুর পর ক্রুসেডারদের মধ্যে অনৈক্য ছড়িয়ে পড়লো। এছাড়া দীর্ঘ যাত্রা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম রোগ-ব্যধিও ছড়িয়ে পড়লো। এভাবে তারা যখন শাম দেশে গিয়ে পৌছলো তখন তাদের অবস্থা ছিলো এমন যেন, তাদেরকে মাত্র কবর থেকে টেনে বের করা হয়েছে। শুধু তাই নয় পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ আর পলায়ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত যখন এই তিন লক্ষ সেনাবাহিনীর বহর 'আল বাক্কা' গিয়ে পৌছেছিলো, তখন তাদের সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে তিন লাখ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলো মাত্র এক হাজারে। তিন লক্ষ থেকে মাত্র এক হাজার সৈন্য শেষ পর্যন্ত এসে পৌছলো সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. এর মোকাবেলা করার জন্য।

এখন আপনিই বলুন, কে বুদ্ধিমান প্রমাণিত হলো? সালাহ উদ্দীন না সেই সব তথাকথিত আলেম, যারা যুদ্ধের কথা শুনে কাপুরুষের মতো পলায়ন করেছিলো?

এই ফ্রেডরিক বার্বারোজা সালাহ উদ্দীনকে অহংকার ও দম্ভের সাথে চিঠি লিখে হুমকি দিয়েছিলো যে, সালাহ উদ্দীন যদি বারো মাসের মধ্যে এই অঞ্চল থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করে, তাহলে তাকে দেখে নেবে, এই করবে সেই করবে...। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন অহংকারী বার্বারোজকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে। আর তিনি তা একবারে সহজভাবেই করে ছাড়লেন। বার্বারোজ শপথ করেছিলো যে সে

ফিলিস্তিনের পবিত্র মাটিতে পা রাখবেই, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে তার শপথ পূরণ করতে দিলেন না। ফিলিস্তিনে আসার আগেই যখন সে মারা গেল, তখন পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে তার পুত্র মৃতদেহটি পানিতে সিদ্ধ করে ভিনেগার মিশিয়ে একটি ড্রামে সংরক্ষণ করল। কিন্তু মৃতদেহটি পঁচে গলে ড্রামটি ফেটে বের হয়ে গেলো। আর তার পুত্র অবশেষে বাধ্য হলো তাকে পথিমধ্যে এক জায়গায় মাটি খুড়ে পুঁতে রাখতে। সে তার সামান্য শপথটুকুও পূরণ করতে পারলো না।

অতএব হে কাফিররা! হে কাফিরদের দোসর মুনাফিকরা! তোমরা ভালো করে জেনে রাখো, আল্লাহর দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে চায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের পরিণতি এমনই করে থাকেন। তোমরা যারা (সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে) ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছো তাদের পরিণতিও এমনই হবে।

ইবনে আসীর রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি নিজ দয়ায়, নিজ কৌশলে উম্মতের কল্যাণের জন্য ফ্রেডরিক বার্বারোজকে হত্যা না করতেন তাহলে আজ হয়তো আমরা বলতাম অতীতে কোনো একটা সময় ছিলো যখন সিরিয়া ও মিশর মুসলমান দেশ ছিলো। পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ ছিলো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দয়া করে যদি মুসলমানদেরকে বিজয় দান না করতেন তাহলে আমরা হয়তো মিশর ও শাম (জর্ডান, লেবানন ও সিরিয়া) গোটা অঞ্চলটিকেই হারিয়ে ফেলতাম এবং হয়তো আমাদেরকে বলতে হতো যে অতীতে এমন একটি সময় ছিলো যখন সেখানে মুসলিমরা বসবাস করতো।

কিন্তু মহান আল্লাহ তার বান্দাদেরকে বিজয় দান করতে চেয়েছেন। অতএব তারা তিন লক্ষ সৈন্য পাঠালো না তিন বিলিয়ন সৈন্য পাঠালো তাতে কিছু যায় আসে না। আল্লাহ যখন পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে চান, যদি কোনো অবস্থার সমাপ্তি চান, যদি এই উম্মাহকে আবারও বিজয় দান করতে চান তাহলে তিনিই এমন পরিস্থিতি তৈরী করবেন যা উম্মাহর বিজয়কে ত্বরান্বিত করবে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

আমরা এই দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম যে, আমাদের উল্লেখিত মূলনীতিটি একটি প্রমাণিত সত্য মূলনীতি। এবার আসুন আমরা আমাদের বর্তমান যুগের অবস্থার উপর কিছু আলোকপাত করি।

১ম দ্রষ্টব্য:

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই বর্তমান সময়ের পরিস্থিতির সাথে সালাহ্ উদ্দীন আইউবী রহ. এর সময়ের মিল রয়েছে। এর মানে কি এই দাঁড়ায় যে, পরবর্তীতে সে রকমই ঘটবে যা সে সময় ঘটেছিল?
তাহলে কি আমরা ধরে নেবো যে আমাদের পরবর্তী পরিস্থিতিও সালাহ উদ্দীন আইউবীর পরবর্তী পরিস্থিতির মতো হবে?
বিষয়টি বোঝার জন্য আসুন আমরা জেনে নিই যে সালাহ্ উদ্দীন আইউবীর বিজয় অর্জনের পূর্বের পরিস্থিতি কেমন ছিলো।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, তৎকালীন সময়ে আলেম-উলামাদের মাঝে দলাদলি, খিলাফাতের মধ্যে ভাগাভাগি, সাধারণ জনগণের মধ্যে কোন্দল; মোটকথা মুসলমানদের অবস্থা মারাত্মক খারাপ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো।
ঐতিহাসিক ইবনে আসীর রহ. বলেন, সে সময় খিলাফাহ মারাত্মকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েছিলো। খিলাফাহ্ শুধু বাগদাদেই শাসনকার্য পরিচালনা করছিল। কেন্দ্রীয় খিলাফাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানরা ছোটো ছোটো রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো।

বাগদাদের বাইরে কেন্দ্রীয় খিলাফতের তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। বসরা নিয়ন্ত্রণ করতো ইবনে রাইক, খুজিস্তান ছিলো আবু আব্দুল্লাহ্র দখলে। পারস্য অঞ্চল ছিলো ইমাদুদ দৌলার নিয়ন্ত্রণে। কারমান অঞ্চল ছিলো আবূ আলী বিন মুহাম্মাদ বিন বায্খ এর অধীনে। আফ্রিকা ও মাগরিব ছিলো আল কাইম ইবনে মাহদীর অধীনে। খোরাসান ছিলো আস সামানীর নিয়ন্ত্রণে।

এই চিত্রের মাধ্যমে আশা করি তৎকালীন অনৈক্যের একটি চিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। অনৈক্যের দিক থেকে আমাদের বর্তমান উম্মাহর অবস্থার সাথে তৎকালীন উম্মাহর একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা এখানে যে কথাটি বলতে চাই তা হলো, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। উম্মাহ যেহেতু বর্তমানে অধ:পতনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, অতএব এরপর উম্মাহর সামনে নিশ্চয়ই বিজয় অপেক্ষা করছে। তাই আমাদের বর্তমান দূরাবস্থার কথা ভেবে মোটেই হতাশ হওয়া চলবে না। একথা মনে করা মোটেই ঠিক হবে না যে, আমাদের এই অবস্থার মনে হয় কোনো শেষ নেই। এমনটি ভাবার মোটেই কোনো কারণ থাকতে পারে না। কারণ পতনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলে তারপর কেবল উত্থানই বাকি থাকে। ব্যাস্ এখন আমাদের সামনে ইনশাআল্লাহ বিজয় অপেক্ষা করছে।

ইবনে আসীর রহ. মুসলিম জাতির দলাদলির আরো কিছু চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, শুধু আন্দালুসেই মুসলিমরা চারটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এর প্রত্যেক রাষ্ট্রনেতাই নিজেকে আমীরুল মুমিনীন বলে দাবী করতে থাকে। এমনকি আমীরুল মু'মিনীনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি একটি হাস্য কৌতুকের বিষয়ে পরিণত হয়। ক্ষমতার মোহে তারা অন্ধ ও উন্মাদ হয়ে পড়েছিলো। ঠিক যেমন বর্তমান সময়ের শাসকরা ক্ষমতার মোহে অন্ধ। ক্ষমতার মোহ তাদেরকে কেমন উন্মাদ করে তুলেছিলো তার একটি উদাহরণ হলো শাসক আর রিদওয়ান। সে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য নিজের আপন দুই ভাইকে হত্যা করে এবং নিজের মসনদ ঠিক রাখতে গিয়ে সে পথভ্রষ্ট বাতেনী সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চায়।

অপর একটি দৃষ্টান্ত হল, আর-রাহা নামে একটি শহর নিয়ে দুই আমীরের মাঝে বিবাদের সূত্রপাত হলে। তাদের একজন রোমান রাজার নিকট অন্য আমীরের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানায়। এমন ফিৎনা ফাসাদের যুগে কুরতুবা নগরীতে উমাইয়া ইবন আব্দুর রহমান বিন হিশাম নামক এক ব্যক্তি রাজপ্রাসাদের দখল নিতে প্রধান ফটকে এসে চিৎকার

করে বলতে থাকে যে, সেই হলো এখন এই রাজ্যের আমীর। কেউ একজন তাকে উপহাস করে বলে যে, শোনো উমাইয়্যাদের দিন এবার শেষ। তখন সে বলতে থাকে, এক দিনে জন্য হলেও তোমরা আমাকে বাইআত দাও। আমাকে একটু আমীর হওয়ার স্বাদ আস্বাদন করতে দাও। তারপর তোমরা চাইলে একদিন পর আমাকে হত্যা করে ফেলো। একদিনই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি এতেই সন্তুষ্ট থাকবো।
বর্তমান সময়ের মতো ধনী গরীবের ব্যবধানও তখন সমাজে মারাত্মক আকার ধারণ করেছিলো। একদিকে সমাজের ক্ষুদ্র একটি শ্রেণী বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলছিলো, আর অন্য দিকে সাধারণ মানুষদের এক বিরাট অংশের অবস্থা ছিলো নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মতো।

ধনীদের বিলাসিতা আর দুনিয়া পূজার একটি উদাহরণ হলো, সুলতান মিনিকশাহ্‌র কন্যার বিয়ে, যাতে প্রদত্ত মোহরানা ও উপঢৌকনের পরিমাণ ছিলো ১৩০টি উট বোঝাই স্বর্ণ ও রৌপ্য। অথচ সেই একই সময়ে কিছু মানুষ এত দরিদ্র ছিল যে কুকুরের মাংস খেয়ে জীবন ধারণে বাধ্য হয়েছিলো।
৪৪৮ হিজরী সনে মানুষের খাদ্যাভাব এতো চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, এক ব্যক্তি সামান্য বিশ পাউন্ড ময়দা খরিদ করার জন্য তার মাথা গোঁজার আশ্রয়, বাড়ি-ঘর বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে উম্মতের মধ্যে কর্মবিমুখতা, স্থবিরতা ও অলসতাও মারাত্মকভাবে জেঁকে বসেছিলো।

ইমাম ইবনে আসীর রহ. তাঁর আল কামিল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রোমানরা ৩৬১ হিজরীতে রাহা নগরী আক্রমণ করলে রাহা নগরী থেকে সাহায্যের আবেদন নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল বাগদাদে মুসলিম খলীফা বখতিয়ার উবাইহীর নিকট আসেন। তারা গিয়ে দেখতে পান যে মুসলিম শাসক শিকার করা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তাদের অভিযোগ শোনার সময় তার নেই।
এই ছিলো সেই সময়কার মুসলিম শাসকদের অবস্থা। যেখানে তার দায়িত্ব ছিলো মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করার জন্য রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার, সেখানে তিনি ব্যস্ত আছেন শিকার নিয়ে। এটা আসলে নতুন কিছু

নয়। উম্মাহর সাথে এমন উপহাস দুনিয়া পূজারী শাসকদের দ্বারা সব সময়ই হয়েছে।

এই তো সেদিনের কথাও স্পষ্ট মনে আছে, আরব দেশের বাদশাহ ওয়াশিংটন ডি.সি. ভ্রমণে এসেছিলেন। সেখানে স্থানীয় মুসলিম সমাজের লোকজনের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তার পূর্ব নির্ধারিত দিন ছিলো মঙ্গলবার। মুসলমানগণ অনেক দিন থেকে এই অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। তারা শুধু অপেক্ষা করছিলেন, কবে মঙ্গলবার আসবে। একদিন আগে হঠাৎ সোমবার দিন দূতাবাস থেকে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হলো যে মঙ্গলবার বাদশাহ অন্য একটি জরুরী মিটিংয়ের কারণে মুসলিম কমিউনিটির সাথে নির্ধারিত অনুষ্ঠানে তিনি আসতে পারবেন না।
সাধারণ মানুষজন ধারণা করেছিল যে হয়ত নিশ্চয়ই আমেরিকা প্রশাসনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষস্থানীয় কোনো ব্যক্তির সাথে এমন কোনো জরুরী কাজ পড়ে গেছে, যেটা হয়তো তার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। হতে পারে সেই মিটিংটা মুসলমানদের জন্য এই অনুষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
আফসোস এই উম্মাহর জন্য! পরবর্তীতে পত্রিকায় খবর বের হলো যে বাদশাহ সেদিন তার স্ত্রীকে নিয়ে একাধারে চার চারটি সিনেমা দেখার মহা আনন্দ উপভোগ করেছেন। তিনি একটা সিনেমা শেষ করে আরেকটি সিনেমায় যাওয়ার জন্য বাদশাহ্ সারাদিন ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। এতোই ব্যস্ত ছিলেন যে তার পক্ষে মুসলিম কমিউনিটির মিটিংয়ে আসা সম্ভব হয়নি!

এই ঘটনা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে মুসলিম উম্মাহ তাদের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব যাদের হাতে অর্পণ করেছে, উম্মাহর প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা কি পরিমাণ!
এরা তো এমন ব্যক্তি যাদেরকে একটি মুদী দোকান চালানোর ব্যাপারেও বিশ্বস্ত মনে করা যায় না, অথচ তারা রাষ্ট্রপ্রধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসন দখল করে আছে। গোটা উম্মাহর ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে বসে আছে।

আবার এই উম্মাহর মধ্যে এমন কতিপয় বেকুবও আছে, যারা বলে থাকে যে আমাদের উচিত এই শাসকদেরকে বাইআত দেয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলা!

যাই হোক, চলুন আবার সেই বাগদাদের ঘটনায় ফিরে যাওয়া যাক। রাহা থেকে প্রতিনিধিদল বাগদাদে এসে খলীফাকে দেখলো যে তিনি শিকার করায় মহাব্যস্ত। তারা খলীফাকে বুঝালেন যে, মুসলমানদের এই দুঃসময়ে শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়। তার উচিত রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা। খলীফা একথা শুনে বললেন, 'আল্লাহু আকবার! আসলেই তো আমার যুদ্ধ করা দরকার। কিন্তু যুদ্ধ করতে তো অর্থ দরকার, তোমরা অর্থ সংগ্রহ করো।' মুসলমানরা তাদের শাসককে অর্থ সংগ্রহ করে দিলো। অথচ সে সেই সমূদয় অর্থ তার ব্যক্তিগত শান শওকত বিলাস ও ব্যসনে খরচ করে ফেললো আর জিহাদের কথা বেমালুম ভুলে গেলো।

ইবনে আসীর রহ. বলেন যে, যখন ক্রুসেডাররা শাম আক্রমণের পরিকল্পনা করে তখন লেবাননের ত্রিপলি থেকে বিখ্যাত আলেম কাযী আবূ আলী ইবনে আম্মার বাগদাদে গমন করেন জনগণকে তাদের সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে। কেননা প্রতীকি অর্থে হলেও বাগদাদকে তখনো খিলাফতের কেন্দ্র মনে করা হতো। কাযী আবূ আলী বাগদাদের কেন্দ্রীয় মসজিদে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি জনগণকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন। জনগণও তার বক্তৃতা শুনে বেশ উদ্বুদ্ধ হয় এবং তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুতি গ্রহণ আরম্ভ করে। আর সুলতানও কাযী আবূ আলীকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠানো হবে। কিন্তু পরিশেষে দেখা গেলো যে খলীফার গাফলতির কারণে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি এবং কোনো বাহিনীও পাঠানো হয়নি। আর জনগণও বিষয়টিকে ধীরে ধীরে বেমালুম ভুলে গেলো।
এদিকে কাজী আবূ আলী নিজ এলাকায় ফিরে দেখতে পান যে তার অনুপস্থিতিতে 'আল-উবাই দিয়ীন' নামক শিয়া গোষ্ঠী ত্রিপোলী দখল করে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের শহরও হারাতে হল।

সুতরাং শাসক শ্রেণীর এমন ভোগ-বিলাস, দুনিয়া পূঁজা ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। এটা অতীতেও হয়েছে এবং তখনও আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাহকে রক্ষা করেছেন এবং বর্তমান এই অবস্থাও তিনি পরিবর্তন করে এই উম্মাহকে রক্ষা করবেন।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য:

আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মাহকে ভবিষ্যত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করছেন। ইমাম ইবনে আসীর রহ. রচিত একটি কিতাব রয়েছে যার নাম হলো 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' তার এই কিতাবে গোটা মানবজাতির ইতিহাস, শুরু থেকে শেষ, আদী অন্ত, পৃথিবী সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের বিষদ আলোচনা রয়েছে। এই কিতাবে শেষ যামানায় ঘটিতব্য ফিৎনা ফাসাদ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে এক অধ্যায়ে সংকলন করা হয়েছে। এই অধ্যায়টিকে আলাদা করে শুধু 'আল ফিতান' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

যদিও উম্মাতের ভবিষ্যত উত্থান হবে সামগ্রিক উত্থান এবং গোটা উম্মতের উত্থান, তথাপিও ফিতান অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উত্থানের ক্ষেত্র হিসেবে কোনো কোনো এলাকার উপর অন্য এলাকার চেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেসব এলাকার উপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুত্বারোপ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে ইরাক।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইরাকীরা ইমাম মাহদীর নিকটতম হবে।[৩]

এরপর রয়েছে খোরাসান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা দেখবে যে খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী দল আসছে

---

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৯৪২, ২২৩৮৮। আবূ দাউদ।

তখন তোমরা তাদের সাথে যোগ দিবে। কেননা তাদের মধ্যেই আল্লাহর খলীফা মাহদী থাকবেন।[৪]

এরপর রয়েছে শাম, বহু হাদীসে শামের ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয়েছে। আর শাম হলো গোটা ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন এবং জর্ডান অঞ্চল নিয়ে গঠিত।[৫]

এই মাত্র বিশ বছর আগেও এই সব অঞ্চলের অবস্থা কি ছিলো?

ইরাকে ছিলো বাথ পার্টির শাসন। যারা শাসনতান্ত্রিকভাবে ছিলো ধর্মনিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের অবস্থান ছিলো ধর্মের বিরুদ্ধে। গোটা আরব অঞ্চলের মধ্যে ইরাকীরা ছিলো আল্লাহর দীন থেকে সবচেয়ে দূরে। তারা মনে প্রাণে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাথ পার্টিকে গ্রহণ করেছিলো, তারা ছিলো চরম জাতীয়তাবাদী।

আমি আক্ষেপ করে এক সময় বলতাম, আল্লাহই ভালো জানেন কবে এবং কিভাবে এদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। আমার ধারণা ছিলো এই ইরাক পরিবর্তন হতে যুগ যুগ সময় লেগে যাবে। সুবহানাল্লাহ! মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরাকের মাটিকে কিভাবে ইসলামের জন্য প্রস্তুত করে দিলেন।

জিহাদ শুরু হওয়ার পূর্বে খোরাসান (আফগানিস্তান অঞ্চল) ছিল কমিউনিজম দ্বারা প্রভাবিত। সেটা ছিলো একটি কমিউনিষ্ট দেশ। আচ্ছা বলুন তো, কমিউনিজম থেকে ইসলামের জন্য কি কোনো কল্যাণ আশা করা যায়? আশির দশকের শুরুর দিকে এই খোরাসান অঞ্চলে প্রথম জিহাদের খবর প্রচার হওয়া আরম্ভ করলো।

---

[৪] ওয়াকী, শারিক, আলী বিন যায়েদ, আবূ কালাবাহ থেকে সাওবান রা. এর সূত্রে ইমাম আহমদ রহ. হাদীসটি সংকলন করেছেন। ইমাম বাযযার তার মুসনাদে আব্দুর রাযযাক সানআনী, সাওরী, খালেদ আল হিযা, আবূ ক্বালাবা, আসমা আর রাহবি এর পিতা থেকে সাওবান রা. এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করে তিনি একে সহীহ বলেছেন।

[৫] শাম অঞ্চলের বারাকাহ ও এর বৈশিষ্ট্য এবং মুসলিম জাতীর উত্থান পতনের সাথে এ অঞ্চলের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে অসংখ্য সহীহ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আগ্রহী পাঠকগণ হাদীস গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দেখে নিতে পারেন।

শামের কেন্দ্রবিন্দু হলো ফিলিস্তিন। এই তো সেদিনও এই ফিলিস্তিনিরা আল্লাহকে এবং ইসলামকে অভিশম্পা করতো। তাদের খ্যাতি ও নাম ছিলো দুর্নীতি আর মদ্যপানে। এটা ছিলো ফিৎনা ফাসাদে ভরা একটি রাষ্ট্র। সিরিয়া ছিলো বাথ পার্টির নিয়ন্ত্রণে। লেবাননকে বলা হতো মধ্যপ্রাচ্যের প্যারিস। এটা ছিলো একটি পার্টি জোন। আরবরা যখন কোনো পার্টি করতে চাইতো তখন তারা বৈরুত চলে আসতো।

ইয়েমেন সম্পর্কিত হাদীসটিতে ইয়েমেনের যে অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে সেটা হলো দক্ষিণ ইয়েমেনের 'আদনে আবইয়ান' অঞ্চল। আর এটিই ছিলো আরবের একমাত্র পরিপূর্ণ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র। হাদীসে বর্ণিত এসব অঞ্চলগুলোর অবস্থার কথা ভেবে এই সেদিনও আমি ভাবতাম, বিজয় বহু দূরে এবং আমার জীবনে তা দেখে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

সুহবানাল্লাহ! মাত্র বিশ বছরের ব্যবধানে কি আশ্চর্যজনক পরিবর্তনই না সাধিত হয়েছে এসব অঞ্চলে। কতো দ্রুত আমরা কতো পরিবর্তিত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি।

প্রথম জিহাদ শুরু হয় ফিলিস্তিনে। আসলে উম্মতের এই পুনরুত্থানের যুগে ফিলিস্তিনই প্রথম শাহাদাতের গুরুত্বকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। আজকাল ফিলিস্তিনে শাহাদাত একটি সামাজিক সংস্কৃতির বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং সাধারণ জনগণ শাহাদাতকে বিবাহ অনুষ্ঠানের চাইতেও উত্তমভাবে উদযাপন করে। এখন সেখানে কোনো যুবক যখন আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে, তখন তাঁর পরিবারের লোকেরা একটি তাবু টানায় এবং অন্যান্য লোকেরা এসে সেই পরিবারকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। যেনো তাঁদের সন্তান নতুন বিবাহ করেছে। যে এলাকার লোকেরা ছিলো আল্লাহর দীন থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে তারাই আজ দীনের সর্বোচ্চ আমল শাহাদাতকে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং এই আমলকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

আফগানিস্তান, যেটি এই সেদিনও ছিলো একটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র, সেই দেশটিই কি না হয়ে উঠলো জিহাদের মারকায। আমার মনে হয় দুনিয়াতে বর্তমানে যতো স্থানে জিহাদ চলছে, আফগানিস্তানের সাথে তার কোনো না

কোনো যোগসূত্র অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। এক কথায় বলা যায় আফগানিস্তান হলো বর্তমান যামানার মহান জিহাদী আমলের সূতিকাগার। চিন্তা করে দেখুন তো একটি কমিউনিষ্ট দেশ, যা গোটা মুসলিম বিশ্বের মধ্যে শিক্ষার হারের দিক থেকে সব চেয়ে নিম্নস্তরে। যে লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে তেমন গভীর জ্ঞানও রাখতো না, তারাই আবির্ভুত হলো গোটা মুসলিম উম্মাহর কান্ডারী হিসেবে। তারা কোনো তথাকথিত বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ও বিখ্যাত আলেম-উলামাও নন, যাদেরকে হর-হামেশা স্যাটেলাইট টেলিভিশনে দেখা যায়। অথচ তারাই এই বিংশ শতাব্দীতে হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ জিহাদকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তাদের মাধ্যমেই জিহাদের পথে মানুষের পুণর্জাগরণ হয়েছে। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর মতো মহান মুজাহিদদের ইলম আফগানিস্তান থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

ইরাকের কথাটি একটু ভেবে দেখুন। এই কয়েক বছর পূর্বেও কি কেউ ভাবতে পেরেছে যে, ইরাক জিহাদী আমলের ক্ষেত্রে পরিণত হবে? কে ভাবতে পারতো যে, সাদ্দামের মতো নাস্তিকের দেশটি জিহাদের পূণ্যভূমিতে পরিণত হবে? এমনকি এটা আমেরিকানরাও ভাবতে পারে নি। তারা ভেবেছিলো যে বাগদাদে তাদেরকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেয়া হবে। তাদের পথে ফুল বিছিয়ে তাদেরকে স্বাগতম জানানো হবে।

সুবহানাল্লাহ! অথচ এই ইরাক এখন মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিহাদের ময়দানে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরাকের ভূমিকে পৃথিবীর ভবিষ্যত পট পরিবর্তনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে প্রস্তুত করছেন। বারো বছরের অবরোধ এবং প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ ছাড়া ইরাকী জনগণও মুজাহিদ রূপে আবির্ভুত হতো না এবং ইরাকও একবিংশ শতাব্দীর মুজাহিদদের যুদ্ধ ফ্রন্ট হিসেবে প্রস্তুত হতো না। আল্লাহ তা'আলা ইরাকী জনগণকে প্রস্তুত করার জন্য একাধিক বুয়াস সংগঠিত করেছেন। কেননা, সাদ্দাম হোসেনের বর্তমানে এমন পরিবর্তন সম্ভব ছিলো না। তাই আল্লাহ তা'আলা আগে তাকে নির্মুল করেছেন -তারই এককালীন বন্ধুদের দ্বারা। ইরাককে নেতৃত্ব শূণ্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা

আমেরিকানদেরকে দিয়ে এই কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তারা এসেছে সাদ্দামকে উৎখাত করতে, অথচ বুঝতেই পারেনি যে এই ফাঁদে পা দিয়ে তারা কোনো মৃত্যুকূপে চলে এসেছে। তারা সাদ্দামকে উৎখাত করেছে আর আল্লাহ তা'আলা আমেরিকার আতঙ্ক আবূ মুসআব আয যারকাবী রহ. কে নেতৃত্বে নিয়ে এসেছেন। এভাবে আমেরিকানরা তাদেরকে আরো ভয়ংকর সমস্যার মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন যে, হয়তো এই 'হাটু পানিতে ডুবে'ই আমেরিকার সলীল সমাধি হবে।

দক্ষিণ ইয়েমেন, যেটি ছিলো আরবের কমিউনিষ্ট এলাকা। সেটিই এখন ইসলামের পূণর্জাগরণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে। যে অঞ্চলটি এই পূণর্জাগরণের কেন্দ্র সেটি হলো 'আদনে আবইয়ান' অঞ্চল। এটিই সেই বিশেষ এলাকা, যার কথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হাদীস সমূহে উল্লেখ করেছেন।

আমরা যদি একটু মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো যে, বিগত বিশ বছরের সামান্য সময়ের মধ্যে এই এলাকাসমূহে অবস্থার কি আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এসব ঘটনাপ্রবাহ কি আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না যে, উম্মাহর বিজয় অতি সন্নিকটে?
অবস্থার এই পরিবর্তন কি প্রমাণ করে না যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব অঞ্চলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেসব অঞ্চলগুলোকে আল্লাহ তা'আলা সমাগত ভবিষ্যত পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করেছেন?
ইরাক, খোরাসান, শাম এবং ইয়েমেনকে আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুত করেছেন পরবর্তী অবস্থার জন্য। আর পরবর্তী অবস্থা কি?
সেই পরবর্তী অবস্থা হলো 'আল মালহামা' (অর্থাৎ ঈসা আ. ও দাজ্জালের মধ্যে সংঘটিতব্য যুদ্ধ যে যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হবে।) কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সকল অঞ্চলের আলোচনা এনেছেন ইমাম মাহদী ও মালহামা প্রসঙ্গে।

আল মালহামা হলো সেই মহাযুদ্ধ, যা সংগঠিত হবে মুসলিম জাতি ও রোমানদের তথা পশ্চিমাদের মধ্যে এবং এর পরই মুসলমানরা বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ্ ব্যবস্থা কায়েমে সক্ষম হবে।

কারণ আমাদের বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বুঝতে হবে। এখন আর নিছক আঞ্চলিক বলতে তেমন কিছু নেই। আমরা এখন গ্লোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গ্রামে বসবাস করছি। এখানে আর আংশিক বিজয়ের কোনো সুযোগ নেই। বিজয় হলে বিশ্বব্যাপী বিজয় আর হারলে বিশ্বব্যাপী হার। অবস্থা এখন আর এমন নেই যে আপনি ছোট্ট কোনো একটি এলাকা জয় করে সেখানে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত করে নিরাপদ থাকবেন। না কিছুতেই এটা এখন আর সম্ভব নয়। বিশ্ব তাগুত আমেরিকা ও তার দোসরদের ঔদ্ধত্য ও জুলুম নির্যাতন এমন প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, তারা খুঁজে বের করে আপনাকে নির্মুল করে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। মানুষেরা মহাকাশ বিদ্যা ও আকাশ পথে আক্রমণের ব্যাপক ক্ষমতা অর্জনের পূর্বের পরিস্থিতি ছিলো ভিন্ন রকমের। তখন একটি পাহাড় দখল করে দূর্গ নির্মাণ করে যুগের পর যুগ নিরাপদে কাটিয়ে দেয়া যেতো। কিন্তু এখন এরকম হলে তারা বি-৫২ বিমান পাঠিয়ে আপনাকে আপনার দূর্গসহ নির্মুল করে দিতে মোটেও বিলম্ব করবে না।

ভবিষ্যত যুদ্ধে হয় সামগ্রিক বিজয় অর্জন করতে হবে অথবা সামগ্রিক পরাজয় বরণ করতে হবে। আর এটাই হলো 'আল মালহামা'র অংশ। এটাই হবে ঈমান ও কুফরের মধ্যকার চূড়ান্ত যুদ্ধ। এটাই সেই যুদ্ধ যা এই উম্মাহকে বিজয় দান করবে। তবে এখানেই শেষ নয়, কারণ এখনো দাজ্জাল রয়ে গেছে। আরো আছে ইয়াজুজ মাজুজ। কিন্তু এটাই হলো সেই যুদ্ধ যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠিত হবে।

অতএব এটা হলো এমন ইঙ্গিত যা প্রমাণ করে যে আমরা সেই সময়ের একান্ত নিকটে এসে পড়েছি। আর সওয়াব অর্জনের এই সোনলী সময়ে দর্শক সারিতে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা যদি অসাধারণ সওয়াব অর্জনের এই সুযোগকে হেলায় হারাই, তাহলে আমাদের মতো নির্বোধ আর কাকে বলা যাবে?

এটা আসলেই সোনালী সময়। হাদীস থেকে এই সময়ের পুরস্কারের কথা জেনে সাহাবা ও সালফে সালেহীনরাও সেসময়ে উপস্থিত থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। সাহাবায়ে কিরামগণ এই সময়ের সওয়াবের বর্ণনা শুনে আকাংখা প্রকাশ করতেন যে আহ! আমরা যদি ঐ সময়ে বেঁচে থাকতাম! উদাহরণ স্বরূপ হযরত আবু হুরায়রা বলেনঃ "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আল-হিন্দ জয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি যদি সেই সময় পেতাম, আমার জান ও মাল উৎসর্গ করতাম। শহীদ হলে শ্রেষ্ঠ শহীদদের একজন হতাম আর যুদ্ধ শেষে জীবিত অবস্থায় ফিরে এলে আমি হতাম মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা।"- আহমাদ, আন-নাসাঈ, আল-হাকীম।

আমরা হতভাগারা এই সোনালী সুবর্ণ সময়ে বসবাস করা সত্ত্বেও নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করছি। এজন্য শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলতেন, জিহাদ একটি মার্কেটের মতো। এটা যখন খোলা হয়, তখনই কেনা-বেচা করে ব্যবসা করে নিতে হয়। মার্কেট যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন হা-হুতাশ করে কোনো লাভ নেই। যখন মার্কেট খোলা থাকে তখন যদি তোমরা পেছনে পড়ে থাকো, ইতস্তত: করো, অনাগ্রহ প্রকাশ করো, তাহলে তোমরা এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ হারাবে, যা তোমাদের জীবনে আর ফিরে নাও আসতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে এটা যেহেতু জিহাদের সোনালী সময়, সেহেতু এর সওয়াবও পরিশ্রম ও ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া এমনিতেই পাওয়া যাবে না। কারণ একাজের বিনিময় যেমন সবচেয়ে বড়, তেমনি একাজ যে ত্যাগ দাবী করে সে ত্যাগও নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় হবে। একারণে যেন তেন লোকেরা এই ত্যাগ স্বীকারও করতে পারবে না এবং এই বিনিময়ও অর্জন করতে পারবে না। উত্তম ঈমানদারদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যাদেরকে পছন্দ করবেন তারাই কেবল এই ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে এবং তারাই কেবল এই মর্যাদা অর্জন করতে পারবে।

ফিৎনার ভয়াবহতা উপলব্ধি করা

প্রথম ইঙ্গিত:

আল মালহামাতে রোমানদের তথা পশ্চিমা শক্তির সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যারা আসবে তাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে তাদের এক তৃতীয়াংশ যুদ্ধ থেকে পলায়ন ও পশ্চাতপসরণ করবে। কি ভয়াবহ অবস্থা হবে চিন্তা করুন!

কারণ এরাই হলো এই উম্মাহর সর্বোত্তম লোক। কারণ কেবল ঈমানদাররাই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বের হতে পারবে। অথচ তাদেরই এক তৃতীয়াংশ আবার কিনা পশ্চাদপসরণ করবে!

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে বলেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কখনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না। এরা তো সেই ঈমানদার যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে বের হয়েছে, এরাই তো সেই মুজাহিদ যারা এই যুদ্ধকে এতো দূর নিয়ে এসেছে। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে যেহেতু তারা পশ্চাদপসরণ করেছে সেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের তাওবা কবুল করবেন না। এমনই ভয়াবহ হবে সে ফিৎনা।[৬]

এই ভয়াবহ ফিৎনার সময়ে অনেক মজবুত ও শক্তিশালী ঈমান ছাড়া আল্লাহর দীনের উপর টিকে থাকা মোটেই সম্ভব নয়। এটা যেন বিশাল মরুভূমি পাড়ি দেয়ার মতো, এখানে গাড়িতে কতোটুকু ফুয়েল আছে, পরিপূর্ণ ভরা আছে, না অর্ধেক আছে, না চারভাগের এক ভাগ আছে এটা কোনো বিষয় নয়। যেভাবেই হোক মরুভূমি সম্পূর্ণ পাড়ি দিতে হবে। শেষ সীমানায় পৌছার আগে যদি গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় তাহলেই মৃত্যু অনিবার্য। এখানে আশি ভাগ রাস্তা পার হওয়া আর ত্রিশ ভাগ পার হওয়া একই কথা। শেষ সীমানায় না পৌছা মানেই নির্ঘাত মৃত্যু।

---

[৬] এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা রা. এর বর্ণনায় 'আল ফিতান ও য়া আশরাতু সা-আহ অধ্যায়ে কসতুনতুনিয়া বিজয়, দাজ্জালের আবির্ভাব ও ঈসা আ. এর অবতরণ পরিচ্ছদে সংকলন করেছেন, ইমাম আওলাকীর বক্তব্য এ সহীহ হাদীসের দ্বারা সমর্থিত।

শেষ যামানায় এই ঈমানদারদের ব্যাপারও একই রকম। এখানে সফলতার জন্য পরিপূর্ণ ঈমান থাকতে হবে। এখানে আধা ঈমান বাস্তবে ঈমান না থাকারই শামিল। এটা বিশেষ সময় এবং বিশেষ মর্যাদা। এই বিশেষ মর্যাদা, এই বিশেষ সম্মাননা তো কেবল তাদেরই প্রাপ্য, যারা ঈমানের মজবুত ও শক্তিশালী স্তরে নিজেদেরকে উন্নীত করতে পেরেছেন। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দোয়া করি, যেনো তিনি আমাদেরকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত:

আমরা যে সেই শেষ সময়ের কাছে চলে এসেছি তার আর একটি ইঙ্গিত হলো কিছু বছর যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পশ্চিমা বিশ্বে (ইহুদী খৃষ্টান) মৌলবাদী চরমপন্থীদের উত্থান আরম্ভ হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ধর্মের ব্যবহারও তাদের মধ্যে বেড়েছে। কিছুদিন পূর্বে নিউজ উইকে বুশ এবং গড সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। সেখানে প্রতিবেদক কিছু ইরোপিয়ান পন্ডিতদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন। যাদের বক্তব্যের সার মর্ম হলো আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির অনেক বহুমুখী লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিগত বৈচিত্র রয়েছে এবং এই তারতম্য নিয়ন্ত্রণে যে নীতিগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে ধর্ম একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম আমাদের মনে হচ্ছে যে ধর্মভিত্তিক কিছু লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জন আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে এবং ধর্মই এক্ষেত্রে প্রায় গোটা পররাষ্ট্রনীতিতে নিয়ন্ত্রণ করছে। বুশ তো একবার ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে একথাই বলেছিলো যে, "গড আমাকে আফগানিস্তানে যেতে বলেছেন।" সুতরাং তার বক্তব্য মতে সংবিধান, কংগ্রেস বা আমেরিকার জনগণ নয়, বরং তার গড তাকে এই যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে।

দেখুন ডেনমার্ক- যে দেশটি কিনা ইউরোপের সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের দাবীদার দেশ অথচ সেখান থেকেই আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর আক্রমণ আরম্ভ হলো। ইতিপূর্বে কেউ চিন্তাই করতে পারেনি যে ডেনমার্কের মতো ছোট্ট একটা দেশ এতো

মারাত্মক একটা অপরাধের কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভুত হবে। আমরা দেখতে পাই নির্লজ্জভাবে গোটা ইউরোপ এহেন জঘণ্যতম অপরাধের হোতা ডেনমার্কের পক্ষ অবলম্বন করলো। গোটা ইউরোপ যে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এবং এক্ষেত্রে তারা কোনো ভদ্রতা, সভ্যতা ও যুক্তি-বুদ্ধির ধার ধারে না, তা আর একবার প্রমাণ হয়ে গেলো। পশ্চিমা দেশগুলি রাষ্ট্রীয়ভাবে এই অপকর্মকে সমর্থন দিয়েছে এবং পশ্চিমা জনগণও একে সমর্থন দিয়েছে। এটা কোনো গোপন বিষয় নয় বরং প্রকাশ্যেই তারা একাজ করেছে। যার কারণে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কার্টুন প্রকাশকারী সেই ওয়েব সাইটটি বন্ধ করে দেয়ার 'অপরাধে' সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তার মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। জনগণের প্রবল চাপে এবং সরকারী সিদ্ধান্তে তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে।

ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপার যখন আসে তখনই পশ্চিমারা মারাত্মক ধর্মভীরু বরং চরমপন্থী মৌলবাদীদের মতো আচরণ করে। মুসলমানদের প্রসঙ্গ আসলেই তারা যেন হঠাৎ মারাত্মক ধর্মীভীরু হয়ে যায়। অথচ বাস্তবে তারা তো ধর্মের বারান্দা দিয়েও হাটে না। এমনকি তাদের বর্তমান (বিকৃত) বাইবেলের শিক্ষাও গ্রহণ করে না।

তৃতীয় ইঙ্গিতঃ

আপনি দেখতে পাবেন ইদানিং পশ্চিমা ধর্মপ্রচারকরা ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আক্রমণাত্মক মন্তব্য করছে। যেমন আমেরিকাতে বিল গ্রাহাম এর পুত্র ফ্রাঙ্কলিন গ্রাহাম বলেছে যে ইসলাম হলো শয়তানের ধর্ম - নাউযুবিল্লাহ। প্যাট রবার্টসন দাবী করে বসলো যে মুসলমানরা হলো ইয়াজুজ মা'জুজ।

এই ধরণের মন্তব্য দিন দিন বেড়েই চলছে, কমছে না। এটা প্রমাণ করে যে আমরা আল মালহামার নিকটবর্তী হয়ে যাচ্ছি। কারণ এসব মন্তব্যের মাধ্যমে একটা মানসিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। যে কোনো যুদ্ধ অস্ত্রের ময়দানের আগে মনস্তাত্তিক অঙ্গনেই আরম্ভ হয়। যুদ্ধের আগে জনগণের

মনোবল চাঙ্গা করার দরকার হয়। আর পশ্চিমারা এসব মন্তব্যের মাধ্যমে তাদের জনগণকে একই সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে এবং মনের দিক থেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলছে।

চতুর্থ ইঙ্গিত:

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে খিলাফাহ্ দান করার পূর্বে তাদেরকে অবশ্যই অনেকগুলো ষ্টেশন অতিক্রম করিয়ে নিবেন। একটি ট্রেন যেমন তার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে আরো অনেকগুলো স্টেশন অতিক্রম করে। ১ম ষ্টেশন, ২য় ষ্টেশন, ৩য় ষ্টেশন। এমন যেসব ষ্টেশন অতিক্রম করে উম্মাহকে বিজয়ের পানে এগিয়ে যেতে হবে তার মধ্যে একটি হলো পরীক্ষার ষ্টেশন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

অর্থ: "তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের এমননিতেই ছেড়ে দেয়া হবে! অথচ আল্লাহ্ জেনে নিবেন না যে তোমাদের মাঝে কে (আল্লাহ্র পথে) যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।" (সূরা তাওবাহ্, আয়াত ১৬)

সুতরাং জান্নাতে যাওয়ার এবং দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে যে দু'টি স্টেশন বা ঘাঁটি অতিক্রম করতে হবে তা হলঃ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ এবং আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাআহ। উম্মতের মধ্যে এই দু'টি আমল কোন শ্রেণী নিষ্ঠার সাথে পালন করছে তা না দেখে আল্লাহ তা'আলা কিছুতেই দুনিয়াতে তাদেরকে বিজয় দান করবেন না। উম্মাহকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে তারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করছে এবং বাস্তব কর্মকান্ডেরর মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে তাদের বন্ধুত্ব ও মিত্রতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারদের সাথে। একই সাথে এটাও প্রমাণ করতে হবে যে, কাফিরদের সাথে তাদের

কোনো প্রকারের মিত্রতা ও বন্ধুত্ব নেই। তাদের প্রতি কোনো আনুগত্য নেই। বরং তাদের প্রতি রয়েছে ঘৃণা ও শত্রুতা।
অনেক আলেম উলামা, ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিম জনসাধারণকে দেখা যায় যে তারা বিভিন্ন অজুহাতে এই দু'টি ষ্টেশনকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চান। তারা এই ষ্টেশনে আসতেই চান না। অথচ বিজয়ের দিবা স্বপ্নে তারা বিভোর। তারা বুঝতে চান না যে বিজয় অর্জন করতে হলে এই ষ্টেশন অতিক্রম করা ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই উম্মাহকে এখন এই পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন যে, আমরা প্রত্যেকে এখন এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি এবং আমাদের প্রত্যেককে এখন ঈমান অথবা কুফর দু'টির যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হবে। আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে আমরা ঈমানদারদের পক্ষে না কাফিরদের পক্ষে। এটা এখন পরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই পরীক্ষার একটি প্রকৃতি হলো এটা সমাজের শাসক ও নেতৃস্থানীয় উঁচু শ্রেণী থেকে আরম্ভ হয় এবং একেবারে নীচু শ্রেণী পর্যন্ত সবাইকে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

শাসক শ্রেণীতে যারা রয়েছেন তাদের পরীক্ষা ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে এবং তারা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে কাফিরদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। তাদের পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত হয়ে গেছে। এরপর আরম্ভ হয়েছে আলেম-উলামাদের পরীক্ষা। এখন তাদের পরীক্ষা চলছে। বিশ্ব তাগুত ও সকল তাগুতদের মুখপাত্র বুশ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে "হয় আমাদের পক্ষে অথবা আমাদের বিপক্ষে।"
বুশ সারা পৃথিবীর শাসকদেরকে পরীক্ষা করে নিছে এবং বলতে গেলে তারাই এখন গোটা দুনিয়াতে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করছে। আর এরা বিশ্ব তাগুতদের একান্ত বাধ্যগত ও অনুগত গভর্ণর, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা পুলিশ অফিসার হিসেবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কাগজপত্রে যদিও তারা স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ কিন্তু বাস্তবে সকলেই বিশ্ব তাগুতদের নিয়োগপ্রাপ্ত গোলাম বৈ কিছুই নয়।

এখন আর মাঝামাঝি কোনো অবস্থান নেই। দুই নৌকায় পারা দেয়ার কোনো সুযোগও নেই। হয় আমাদের পক্ষে না হয় আমাদের বিরুদ্ধে। দশ বছর আগেও হয়তো আপনি জুমআর খুতবায় জিহাদের প্রতি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে জ্বালাময়ী বক্তব্য দেয়ার পরও রাতে প্রেসিডেন্টের সাথে ডিনারে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু এখন আর তা মোটেও সম্ভব নয়। উভয় পক্ষের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলার দিন শেষ। এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি কোনে পক্ষে? এখন আর কোনো সাধা-কালোর মাঝখানে গ্রে-এরিয়া বলতে কিছু নেই। এখন হয় সাদা, নয় কালো। একারণেই পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

অর্থ: "মহান আল্লাহ কিছুতেই ঈমানদারদেরকে তারা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থার উপর ছেড়ে দিবেন না। যতক্ষণ না পবিত্র (ঈমানদারদের) থেকে অপবিত্র (মুনাফিকদেরকে) আলাদা করে ফেলেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯)

একদল নিফাকমুক্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার এবং অন্যদল ঈমানহীন নির্লজ্জার মুনাফিক-কাফিরের দল। এখন তো মুনাফিক আর ঈমানদার সব একত্রে মিলে-মিশে আছে। আর এ অবস্থায় বিজয় আসে না। বরং বিজয়ের জন্য উভয় দল আলাদা হয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ফায়সালা করেছেন যে, বুশ এই পরীক্ষার একটি পক্ষ হবে। আর তাই সে গোটা উম্মাহকে এই পরীক্ষায় ফেলেছে যে, 'তোমরা আমাদের পক্ষে, না মুজাহিদদের পক্ষে। অন্যদিকে মুজাহিদরা উম্মাহকে পরীক্ষায় ফেলেছে যে, তোমরা কি মুজাহিদদের পক্ষে না কাফিরদের পক্ষে। এখন আপনাদের সামনে শুধু দু'টো রাস্তা খোলা। হয় মুজাহিদদের পক্ষে যেতে হবে, অথবা কাফিরদের পক্ষে যেতে হবে। মাঝামাঝি কোনো

রাস্তা নেই। এটাকেই আমেরিকানরা বলে থাকে 'ব্যাটল অব দ্য হার্টস এন্ড মাইন্ড' (মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ)। এই লড়াই হক এবং বাতিলের লড়াই। এখানে ইতস্তত: করার কিছু নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.

অর্থ: "আর যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ্র দল এবং তারাই বিজয়ী।" (সূরা মায়িদাহ্, ৫৬)

অতএব এই উম্মাহ বিজয়ী হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং ঈমানদারদের প্রতি প্রকাশ্যে ও মনেপ্রাণে আপ্রাণভাবে মিত্রতা পোষণ না করবে।

পাঠকদের স্মরণের জন্য মনে করিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি উম্মাহর খারাপ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান তাহলে তিনি এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরী করে দিবেন। এ মূলনীতির প্রমাণে আমরা তিনটি বাস্তব ভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করেছি। মদীনার আওস ও খাযরাজের বুয়াস যুদ্ধ। পারস্য সম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধের সময় সংঘটিত ঘটনা এবং সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. এর সময়ের ঘটনা। আমরা আরো বলেছি যে,

১. ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।
২. আল্লাহ কিছু বিশেষ অঞ্চলকে প্রস্তুত করছেন।
৩. পশ্চিমা বিশ্বে মৌলবাদী চরমপন্থা বাড়ছে।
৪. উম্মাহকে বিজয় অর্জন করতে হলে অবশ্যই এমন কয়েকটি ষ্টেশন অতিক্রম করতে হবে যেগুলো পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

উম্মাহর বর্তমান দূরাবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়

আমরা সকলেই একথা একবাক্যে স্বীকার করি যে, আমরা অনেক সমস্যায় আছি। আমরা গোটা মুসলিম উম্মাহ ভয়াবহ সমস্যা ও মারাত্মক খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় পার করছে। কিন্তু যখনই আমরা এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে বসি, তখনই আমরা একেকজন একেক ধরণের বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকি। একেকজন একেক মত পেশ করতে থাকি। কিন্তু আমরা সকলে যদি কুরআন ও সুন্নাহকে মেনে নিতে সম্মত হই, তাহলে আমাদের এই মতের ও পথের কোনো পার্থক্য থাকার কথা নয়। আমরা সকলে আমাদের প্রশ্নের জবাব যদি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করতে সম্মত হই, তাহলে আর মতপার্থক্যের কোনো সুযোগ থাকে না। তাহলে আসুন আমরা জেনে নিই আমাদের এই দূরাবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

আমাদের এই দূরাবস্থায় পতিত হওয়ার কারণ এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.

অর্থ: "যখন তোমরা কেবল ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, গরুর লেজের (দুনিয়ার) পেছনে ছুটবে, ক্ষেত-খামারী কৃষি কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। আর ততক্ষণ তিনি এই লাঞ্ছনা তুলে নিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের আসল দীনের (জিহাদের) প্রতি ফিরে আসবে।"[৭]

---

[৭] সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়- ২৩, হাদীস নং ৩৪৫৫; সহীহ আল-জামী', হাদীস নং- ৬৮৮; আহমদ, হাদীস নং ৪৮২৫ এবং আবু উমাইয়া আত-তারসূসী হতে মুসনাদ ইবনে উমার, হাদীস নং- ২২।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীসটিতে আমাদেরকে সমস্যা, সমস্যায় পতিত হওয়ার কারণ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। আজকাল আমাদের এই সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করতে বসলে একেকজন একেক বিষয়কে সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেন এবং নিজের মনগড়া সমাধান দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু যাঁরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে এই দূরাবস্থার কারণ ও তার সমাধান জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এই একটি হাদীসই যথেষ্ট।

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, আমরা যখন ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, গরু-বাছুর তথা দুনিয়া কামাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বো এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দিবো, তখন আমাদের কপালে অপমান, অপদস্ত, লাঞ্চনা, গঞ্জনা ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।

আজকাল তথাকথিত মুসলমানদের অনেককে বলতে শোনা যায় যে, মুসলমানদের এই দূরাবস্থার কারণ হলো মুসলমানরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, জ্ঞান-গবেষণা, উৎপাদন ও শিল্প কল কারখানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া। মুসলমানরা যদি অন্যান্য জাতির মতো এসব ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নতি সাধন করতে পারতো, তাহলে মুসলমানরা অনেক উন্নত জাতিতে পরিণত হতো।

অনেককে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে শোনা যায় মুসলমানরা যদি (কাফিরদের ভাষায়) সন্ত্রাসবাদ/জঙ্গিবাদ (ইসলামের ভাষায় জিহাদ) থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতো এবং নিজেদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নে নিয়োজিত করতো তাহলে তারা দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে পারতো। অথচ স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য মতে এটি সম্পূর্ণ একটি ভুল, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য। শুধু তাই নয় বরং আমরা যদি এমনটি করি তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। তিনি উল্লেখিত হাদীসে সমাধান বলেছেন আসল দীনের ফিরে যাওয়া। হাদীস বিশারদগণ এ হাদীসের ব্যখ্যায় বলেছেন এখানে আসল দীনে ফেরৎ আসার অর্থ হলো জিহাদের

পথে ফিরে আসা। জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ ছেড়ে দেয়ার নাম হলো আল্লাহর দীনকে পরিত্যাগ করা। জিহাদ মানে দীন আর দীন মানেই জিহাদ। অতএব আমাদের এই অবস্থার একমাত্র সমাধান হলো জিহাদের পথে ফিরে আসা।

ইবনে রজব আল হাম্বলী রহ. বর্ণনা করেন যে সালাফদের কোনো এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো আপনি তো নিজ পরিবারের জন্য একটি খামার বানাতে পারেন, কিন্তু বানাচ্ছেন না কেন?

তিনি বললেন, দেখ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে খামার বানাতে পাঠান নি। বরং খামারীদেরকে হত্যা করে খামার ছিনিয়ে নিতে পাঠিয়েছেন!

একারণেই হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. যখন শুনলেন যে জর্দানের উর্বর ভূমি বিজয়ের পর সাহাবায়ে কিরামগণের কেউ কেউ জিহাদ ছেড়ে দিয়ে জমি চাষাবাদে লেগে গেছে তখন তিনি মারাত্মকভাবে রেগে গেলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন ফসল পাকে। তারপর যখন সে জমির ফসল পেকে আসলো তখন তিনি তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন।

সাহাবায়ে কিরামদের কেউ কেউ যখন তার কাছে অভিযোগের সূরে কথা বলছিলো তখন তিনি বললেন, দেখো জমি চাষাবাদ করা ইহুদী নাসারাদের কাজ। তোমাদের কাজ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর দীনকে প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা। তোমরা এই চাষাবাদের দায়িত্ব ইহুদী নাসরাদের উপর ছেড়ে দাও, তোমরা আল্লাহর দীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে বেড়িয়ে পরো। তারাই চাষাবাদ করে তোমাদেরকে খাওয়াবে। তারা জিযিয়া দিবে। তারা খেরাজ দিবে। সেগুলো তোমরা খাবে। তোমরা কি দেখো না যে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الصغار والذلة على من خالف أمر.

অর্থ: "আমার রিযক আমার তলোয়ারের ছায়াতলে। আর যারা আমার বিরোধিতা করবে, তাদের ভাগ্যে অপমান ও লাঞ্ছনা অবধারিত।"[৮]

---

[৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৫১১৪।

অতএব আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিযক যদি গণীমতের মাধ্যমে আসে তাহহেল নিশ্চয়ই গনীমাতের মাধ্যমে আসা রিযক সর্বোত্তম রিযক। অবশ্যই তা ব্যবসা বাণিজ্য, চাষাবাদ, গবাদি পশু পালন ইত্যাদির দ্বারা উপার্জিত রিষকের চেয়ে অনেক উত্তম।

কিছুদিন আগে ইরাকে যুদ্ধরত একজন মহান মুজাহিদের একটি ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছিলো। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে আপনাদের অর্থনৈতিক উৎস কি?

তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের অর্থনৈতিক উৎস হলো গণীমাত। তবে মুসলমানরা যদি আমাদেরকে কোনো সহযোগিতা করে তাহলে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করে থাকি। তারা মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করবে না। তারা গণীমাত দিয়ে তাদের জিহাদের অর্থের প্রয়োজন পূরণ করবে।

অতএব সবশেষে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে উম্মতের যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ। উম্মাহ যখন এই একটি আমলের উপর উঠে আসবে, এই ইবাদতটি যখন সঠিকভাবে আরম্ভ করবে, যখন এই পথে উম্মাহ অটল অবিচল দাঁড়িয়ে যাবে তখন তাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। লোকেরা জিহাদকে ভয় পায়, কারণ তারা মনে করে জিহাদ করতে গেলে জান-মাল খোয়াতে হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তবতা হলো, উম্মাহ যখন আল্লাহর পথে জিহাদরত থাকে তখন উম্মাহ সম্পদশালী হয় এবং তারা সবচেয়ে কম সংখ্যক নিহত হয়।

আমরা যদি উম্মাহর মৃত্যুর আনুপাতিক হার দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে উম্মাহ যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তখন তাদের নিহতের আনুপাতিক হার ছিলো খুবই কম। অথচ তারা যখন জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে তখন উম্মতের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ কুফফারদের হাতে নিহত হয়েছে। যদি অর্থনৈতিক অবস্থার উপর জরিপ চালাই তাহলে দেখতে পাই যে, উম্মাহ যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তখন উম্মাহ সব চেয়ে সম্পদশালী হয়েছে। আর যখন উম্মাহ আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দিয়েছে, তখন তারা সবচেয়ে দরিদ্র জাতিতে পরিণত হয়েছে।

ইসলামিক রাষ্ট্রের মতো এমন জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ইতিহাসে দ্বিতীয়টি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্র কখনো তার মুসলিম

জনগণের উপর কোনো ট্যাক্স আরোপ করে নি। কিভাবে তারা কোনো রকম ট্যাক্স ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা করে? কারণ যাকাত ছাড়াও এই রাষ্ট্রের রাজস্বের প্রধানতম উৎস ছিলো জিযিয়া, খেরাজ, গনীমাত এবং ফাঈ। আর এই সকল উপার্জনের মূল উৎস হলো জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ। আর বর্তমান মুসলিম উম্মাহ জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ ছেড়ে দিয়েছে এবং এর পরিণামে তারা তাদের জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়েছে। অথচ ইসলামী শরীয়াতে 'সকল প্রকার ট্যাক্স হারাম এবং ট্যাক্স সংশ্লিষ্ট কোনো কাজে যারা নিয়োজিত থাকে তারা প্রত্যেকে অভিশপ্ত।

(ইসলামের দৃষ্টিতে ট্যাক্সের মাধ্যমে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন এতই জঘন্যতম নিকৃষ্ট কাজ যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য আখ্যা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় এক মহিলা ব্যভিচার করার পর এতই অনুতপ্ত হন যে তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে তার গুনাহের কথা স্বীকার করেন যাতে তার উপর আল্লাহর বিধান (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) কায়েম করা হয় এবং আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে তাকে মাফ করে দেন। এই মহিলার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 'সে এমন তাওবা করেছে যে, অন্যায়ভাবে ট্যাক্স আদায়কারীরাও যদি এভাবে তওবা করতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও মাফ করে দিতেন।' (মুসলিম, হাদীস নং ৩২০৮)

সহীহ মুসলিমের প্রখ্যাত ব্যখ্যাকার ইমাম নববী রহ. এই হাদীসের ব্যখ্যায় বলেন, "আল্লাহর রাসূলের এ বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে ট্যাক্স (আরোপ ও আদায়) এমন একটি জঘন্যতম কবীরা গুনাহ, যা মানুষকে অবধারিতভাবে জাহান্নামী করে দেয়।)

এটাই হলো মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। আমাদের শুধু উপরোক্ত হাদীসটির মর্ম ভালোভাবে উপলব্ধি করা উচিত এবং এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা উচিত।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।